













চন্দ্রশেখর ।

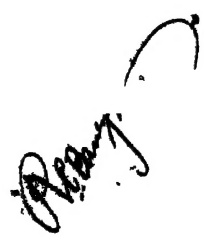
---

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ।

পঞ্চম সংস্করণ ।

HARE PRESS : CALCUTTA.  
1897.

মূল্য ১৯০ টাকা ।



---

**Calcutta:**

**PRINTED BY R. DUTT,**

**HARE PRESS:**

**46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.**

**PUBLISHED BY UMACHARAN BANERJEE,**

**5, PRAJAP CHATTERJEE'S LANE.**

---

## বিজ্ঞাপন।

“চন্দ্রশেখর” প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সয়ের মতাক্ষরীন্ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনূবাদ আছে ; ঐতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রাক্ষনের যোগ্য।

---





## উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

— ০০ —

বালক বালিকা।

ভাগীরথীতীরে, আশ্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর  
শব্দা জলকল্লোল শ্রবণ করিতোছিল। তাহার পদতলে, নব-  
দুর্লাভযায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার  
মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ, নদী,  
বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের  
নাম প্রতাপ—বালিকার নাম শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত  
আট বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোরবয়স্ক।

মাথায় উপত্রে, শকতবস্ত্রে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া, পাগিয়া  
ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া, গদাধূল-

বিবাহী আশ্রয়কানন কম্পিত করিতে লাগিল। গন্ধার'র তর  
রব সে স্বাক্ষর সঙ্গী-সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

বালিকা, ক্রুদ্ধ করপন্নবে, তৎক্ষণে স্বকুমার বস্ত্র কুস্থম চরন  
করিয়া মালা গাঁথিয়া, বালকের গলার পরাইল। আবার খুলিয়া  
লইয়া আপন কবরীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকের গলার  
পরাইল। এ তির হইল না—কে মালা পরিবে; নিকটে হুট্টা  
পুট্টা একটা গাই চরিতেছে দেখিয়া শৈবলিনী বিবাদের মালা  
তাহার শূণ্ণে পরাইয়া আসিল : “তখন” বিবাদ মিটিল। এইরূপ  
ইহাদের সর্বদা হইত। কখন বা মালার বিনিময়ে বালক, নীড়  
হইতে পক্ষিধাবক পাড়িয়া দিত, আশ্রয়ে সময়ে সুপক আশ্র  
পাড়িয়া দিত।

সন্ধ্যার কোমল অংশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গণিতে  
বসিল। কে আগে দেখিরাছে? কোন্টা আগে উঠিরাছে?  
তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ? চারিটা? আমি পাঁচটা দেখি-  
তেছি। ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা।  
মিথ্যা কথা, শৈবলিনী তিনটা বৈ দেখিতেছে না।

নোকা গণ। কয়খানা নোকা ঘাইতেছে বল দেখি? বোল  
খানা? বাজি রাখ, আঠার খানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত  
না; একবার গণিয়া নয় খানা হইল, আর একবার গণিয়া  
একুশ খানা হইল। তার পর গণনা ছাড়িয়া, উভয়ে একাগ্র-  
চিহ্নে একখানি নোকায় প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নোকা  
কে আছে—কোথা বাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের  
জলে কেমন সোণা আলিতেছে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডুবিব বা কে, উঠিব বা কে ।

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল । প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল । যোগ্য বৎসরের নারক—আট বৎসরের নারিক! বালকের ভায় কেহ ভালবাসিতে জানে না ।

বাল্যকালের ভালবাসার বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে । যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছে, তাহাদের কর অনেক সঙ্গ যৌবনে দেখা সাক্ষাৎ হয় ? কর জন বাঁচিয়া থাকে ? কর জন ভালবাসার যোগ্য থাকে ? বার্লুকো বাল্যে প্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সৰ্বল বিলুপ্ত হয় । কিন্তু সেই স্মৃতি কত মধুর ।

বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সূত্রে অহত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখখণ্ড অতি মধুর—উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে । খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে । কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে । তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথার কালপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে । তাহার অন্ত পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতি মাত্র আছে । বাল্য-প্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে ।

শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে । প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না । শৈবলিনী প্রতাপের



জ্ঞাতিকণ্ঠা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল।

শৈবলিনী দরিত্রের কন্ডাণ কেহ ছিল না—কেবল মাতা। তাহাদের কিছু ছিল না, কেবল একখানি কুটীর—আর শৈবলিনীর রূপরশি। প্রতাপও দরিত্র।

শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—সৌন্দর্যের ষোল কলা পুথিতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে? সে অরণ্যমধ্যে হুক্কান করিয়া কে এসে রূপরশি অমূল্য বলিয়া তুলিয়া লইয়া আসিবে?

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে স্মৃতি নাই। বুঝিল, এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

তুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ করিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইলে, তুই জনে গজান্বানে গেল। গজার অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল, আর শৈবলিনি! সাঁতার দিই। তুই জনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সমুদ্রগে তুই জনেই পটু—ভেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলে পারিত না। বর্ষাকাল—কূলে কূলে গজার জল—জল ছলিয়া ছলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া বাইতেছে। তুই জনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্লিষ্ট করিয়া, সাঁতার দিয়া চলিল; ফেনচক্রমধ্যে, সুন্দর নবীন বগুধর রূজতানুরীয় মধ্যে রত্নযুগলের দ্বারা শোভিতে লাগিল।

সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে

যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা  
 গুনিল না—চলিল। অবার সুকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল  
 —গালি দিল—তুই জনের কেহ গুনিল না—চলিল। অনেক  
 দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, “শৈবলিনি, এই আমাদের বিয়ে !”

শৈবলিনী বলিল, “আর কেন—এইখানেই ।” •

প্রতাপ ডুবিল।

“শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল।  
 মনে ভাবিল—কেন মরিব ? প্রতাপ আমার কে ? আমার ভয়  
 করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল।  
 সস্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বয় মিলিল ।

যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি  
 পান্সি বাহিয়া যাইতেছিল। নোকারোহী একজন দেখিল—  
 প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নোকারোহী—  
 চক্রেপথর শব্দ।

চক্রেপথর সস্তরণ করিয়া, প্রতাপকে ধরিয়া নোকার উঠাই-  
 লেন। তাহাকে নোকার লইয়া তীরে নোকা লাগাইলেন।  
 লগ্নে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে । ১।

প্রতাপের মাতা ছাড়িল না। চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া, সে দিন তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করাইল। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না।

শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন।—দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

চন্দ্রশেখর তখন নিজে একটু বিপদগ্রস্ত। তিনি বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থ, অথচ সংসারী নহেন। এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাট; দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জনের বিষয় ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিকৃৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিক কাল গর্ত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানোপার্জনের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়; অধায়ন অধ্যাপনার বিষয় ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, দেবসেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছে। তৎসম্বন্ধীয় কাঙ্গা স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপন্থত হয়—দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে না—গৃহধর্মের বিশৃঙ্খলা ঘটে,—এমন কি, সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখেন, কাহাকে দেন, মনে থাকে না। খরচ নাই—অথচ অর্থে কুলার না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।

কিন্তু চন্দ্রশেখর স্থির করিলেন, যদি বিবাহ করি, তবে সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না। কেননা, সুন্দরীর দ্বারী মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা। সংসার বন্ধনে মুগ্ধ হওয়া হইবে না।

• মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্র-  
শেখরের সাক্ষাৎ হইল । • শৈবলিনীকে দেখিয়া, সংযমীর ত্রু-  
ত্ব হইল । ভাবিয়া, চিন্তিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে  
• চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন ।  
সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয় ? •

এই বিবাহের আট বৎসর পরে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ  
হইতেছে । • • • • •







---

## চন্দ্রশেখর ।

---

প্রথম খণ্ড ।

---

পাপীয়সী ।

---

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

---

দলনী বেগম ।

সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীর কাসেম খাঁ মুক্কেয়ের দুর্গে বসতি করেন । দুর্গ মধ্যে, অন্তঃ-পুরে, রত্নমহলে, একস্থানে বড় শোভা । রাত্রির প্রথম প্রহর এখনও স্নাতীর্ত হয় নাই । প্রকোষ্ঠমধ্যে, সুরঞ্জিত হস্তাতলে, সুকোমল গালিচা পাতা । রত্ন-দীপে গন্ধতৈলে আলিত

আলোক বলিতেছে। সুগন্ধ কুসুমবাহের স্বাদে গৃহ পরিপূরিত  
হইয়াছে। কিম্বাবের বালিশে একটি ক্ষুদ্র মস্তক বিস্তৃত  
করিয়া একটি ক্ষুদ্রকারা বালিকাকৃতি যুবতী শয়ন করিয়া গুলেস্তা।  
পড়িবার জন্ত বস পাঠিতেছে। যুবতী সপ্তদশবর্ষীয়া, কিন্তু  
ধর্মাকৃত্তা বালিকার জায় স্কুমার। গুলেস্তা পড়িতেছে,  
এক একবার উঠিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, এবং আপন মনে কতই  
কি বলিতেছে। কখন বলিতেছে, “এখনও এলেন না কেন ?”  
আবার বলিতেছে, “কেন আসিবেন ? হাজার দাসীর মধ্যে  
আমি একজন দাসীমাত্র, আমার জন্ত এতদূর আসিবেন কেন ?”  
বালিকা আবার গুলেস্তা পড়িতে প্রবৃত্ত হইল। আবার অল্পদূর  
পড়িয়াই বলিল, “ভাল লাগে না। ভাল, নাই আসুন, আমাকে  
স্মরণ করিলেই ত আমি বাই। তা আমাকে মনে পড়িবে কেন ?  
আমি হাজার দাসীর মধ্যে একজন বৈ ত নই।” আবার  
গুলেস্তা পড়িতে আবৃত্ত করিল, আবার পুস্তক ফেলিল, বলিল,  
“ভাল, ঈশ্বর কেন এমন করেন ? একজন কেন আর একজনের  
পথ চেয়ে পড়িয়া থাকে ? যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে বে  
যাকে পায়, সে তাকেই তাঁর না কেন ? যাকে না পায়, তাকে  
চার কেন ? আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন ?”  
তখন যুবতী পুস্তক ভাগ করিয়া, গাভোথান করিল। নির্দোষ-  
গঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লবিত ভুজঙ্গরাশি তুলা নিবিড় কৃষ্ণিত কেশ-  
ভার ছিলিল—বর্ণরচিত সুগন্ধ-বিকীর্ণকারী উজ্জল উত্তরীর  
ছিলিল—ভাষার অঙ্গসংগলন মাত্র গৃহমধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ  
উঠিল। অগাধ বলিলে যেমন চাকল্য মাজে তরঙ্গ উঠে, তেমনি  
তরঙ্গ উঠিল।

তখন, সন্ধ্যায় এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে বজা দিল, এবং ধীরে ধীরে, অতি সুহৃৎস্বরে, মিত্র আরম্ভ করিল—যেন প্রোতাস তরে ভীতা হইয়া গারিতেছে । প্রথমত সময়ে, নিকটস্থ গ্রহরীর অভিবাদন-শব্দ এবং বাহকদিগের পদধ্বনি তাহার কর্ণরঞ্জে, প্রবেশ করিল । বালিকা চমকিয়া উঠিয়া, ব্যস্ত হইয়া দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল । দেখিল, নবাবের তাজাম । নবাব মীর কাসেম আলি খাঁ তাজাম হইতে অবতরণ পূর্বক, এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

নবাব আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “দলনী বিবি, কি গারিতেছিলে ?” সুবতীর নাম, বোধ হয়, দৌলতউল্লাহ নবাব তাহাকে সংক্ষেপার্থ ‘দলনী’ বলিতেন । এজন্য গৌরবান্বিত সকলেই “দলনী বেগম” বা “দলনী বিবি” বলিত ।

দলনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিল । দলনীর দুর্ভাগ্যক্রমে নবাব বলিলেন, “তুমি যাহা গারিতেছিলে, গাও—আমি শুনিব ।”

তখন মহাগোলযোগ বাধিল । তখন বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুর বাঁধে না । বীণা, ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরা বলিতে লাগিল, বোধ হইল । নবাব বলিলেন, “হঠাৎ, তুমি উহার সঙ্গে গাও ।” তাহাতে দলনীর মনে হইল যেন, নবাব মনে করিয়াছেন, দলনীর সুরবোধ নাই । তার পর,—তার পর, দলনীর মুখ ফুটিল না ! দলনী মুখ ফুটাইতে কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই মুখ কথা শুনিল না—কিছুতেই, ফুটিল না ! মুখ, কোটে কোটে, কোটে না । যেদিক্‌র দিনে হলকমলিনীর তার, মুখ যেন কোটে কোটে, তবু কোটে



না। উক কবির কবিতা-কুম্বের জ্ঞান, যুথ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। মানিনী জীলোকের মানকালীন কর্তাগত প্রণয়সম্বোধনের জ্ঞান, ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না।

তখন দলনী সহসা বীণা ত্যাগ করিয়া বলিল, “আমি গায়িব না।”

নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন? রাগ না কি?”

দ। কলিকাতার ইংরেজেরা যে বাজরা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সমুপে পুনর্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, “যদি সে পথে কাঁটা না পড়ে, তবে আবশ্যিক।”

স। কাঁটা পড়িবে কেন?

নবাব হুঃখিত হইয়া বলিলেন, “ব্যক্তি তাহাদিগের সঙ্গে বিরোধ উৎস্থিত হয়। কেন, তুমি সে সকল কথা শুন নাই?”

“ওনিয়াছি” বলিয়া দলনী নীরব চইল। মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, “দলনী বিবি, অন্তমনা হইয়া কি ভাবিতেছ?”

দলনী বলিল, “আপনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, যে ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই হারিবে—তবে কেন আপনি তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন?—আমি বাজিকা, দাসী, এ সকল কথা আমার বলা নিতান্ত অজ্ঞান, কিন্তু বলিবার একটা অধিকার আছে। আপনিসমুখ করিয়া আমাকে ভালবাসেন।”

নবাব বলিলেন, “সে কথা সত্য দলনী,—আমি তোমাকে ভালবাসি।, তোমাকে যেমন ভালবাসি, আমি কখন স্ত্রী-জাতিকে এরূপ ভালবাসি নাই, যা বাসিব বলিয়া মনে করি নাই।”

দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল। দলনী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল—তাহার চক্ষে জল পড়িল। চক্ষের জল মুছিয়া বলিল,—

“যদি জানেন, যে ইংরেজের বিরোধী হইবে, সেই হারিবে, তবে কেন তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?”

মীরকাসেম কিঞ্চিৎ মুঃতব্বরে কহিলেন, ‘আমার আর উপায় নাই। তুমি নিত্যন্ত আমারই এই ‘জন্তু’ তোমার সক্ষমতাে বলিতেছি—আমি নিশ্চয় জানি এ বিবাদে আমি রাজ্য নষ্ট হইব, হয় ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ কল্লিতে চাই? ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাঁরাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রাণে-জন? কেবল তাহাঁই নহে। তাহারা বলেন, ‘রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।’ কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজ উদৌলা নহি—বা, মীরজাকরও নহি।”

দলনী মনে মনে বাঙ্গালার অধীশ্বরের শত শত প্রশংসা করিল। বলিল, “প্রাণেশ্বর! আপনি বাহা বলিলেন, তাহাতে

আমি কি বলিব ? কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে । আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না ।”

মীরকা । এ বিষয়ে কি, বাঙ্গালার নবাবের কর্তব্য যে, ত্রীলোকের পরামর্শ শুনে ? না বালিকার কর্তব্য যে এ বিষয়ে পরামর্শ দেয় ?

দলনী অপ্রতিভ হইল, ক্রুদ্ধ হইল । বলিল, “আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি, অপরাধ মার্জনা করুন । ত্রীলোকের মন সহজ বুঝে না বলিয়াই এ সকল কথা বলিয়াছি । কিন্তু আর, একটি ভিক্ষা চাই ।”

“কি ?”

“আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন ?”

“কেন, তুমি যুদ্ধ করিবে না কি ? বল, গুরুগণ থাকে বর-তরফ করিয়া তোমার বাহাল করি ।”

দলনী আবার অপ্রতিভ হইল, কথা কহিতে পারিল না । মীরকাসেম, তখন স্নেহভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন যাইতে চাও ?”

“আপনার সঙ্গে থাকিব বলিয়া ।” মীরকাসেম অস্বীকৃত করিলেন । কিছুতেই সম্মত হইলেন না ।

দলনী তখন ঈর্ষ্য হাসিয়া কহিল, “জাঁহাপনা ! আপনি গণিতে জানেন ; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময়ে কোথায় থাকিব ?”

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, “তবে কলমদান দাও ।”

দলনীর আত্মাক্রমে পরিচারিকা সুবর্ণনির্মিত কলমদান আনিয়া দিল ।

মীরকাসেম হিন্দুদিগের নিকট অগাতিব শিক্ষা করিয়া-

ছিলেন। শিক্ষামন্ত্র অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, “কি দেখিলেন?”

মীরকাসেম বলিলেন, “যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়-কর। তুমি শুনিও না।”

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীরমুনসীকে ডাকাইয়া অজ্ঞা দিলেন, “মুরশিদাবাদে একজন হিন্দু কর্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধাশুভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ পরে, দলনী বেগম কোথায় থাকিবে?”

মীরমুনসী তাহাই করিল। চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক পাঠাইল।

## ৯ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

— ০০ —

### ভীমা পুকুরিণী।

ভীমা নামে বৃহৎ পুকুরিণীর চারি ধারে, ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ হুয়োর হেনাত মোড় পুকুরিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের পাশে, কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতায় লতায় একত্র অঙ্কিত হইয়া, জল পর্য্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়া রাখিত। সেই আবৃত অলঙ্কার মধ্যে শৈবলিনী এত সুন্দরী ধাতুকলনী হস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝ না, আমরা জল নই। যিনি কখন রূপ দেখিয়া গিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন। তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন করিয়া জল কলসীত্যাগে তরঙ্গ তুলিয়া, বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার-শিঞ্জিতের তালে, তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরি গ্রথিত জলজপুষ্পের মালা দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। সস্তরণ কুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্বক্কে, হৃদয়ে উকিঝুকি মারিয়া; জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে।

আবার যুবতী কেমন কলসী ভাসাইয়া দিয়া, মুহূৰ্ত্তব্যুহ হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া, বিদ্বাধরে জলম্পৃষ্ট করে, বক্তৃমধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে ; সূর্যাভিমুখে প্রতাপ্রেরণ করে ; জল পতনকালে বিধে বিধে শত সূর্যা ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয় । যুবতীর হস্তপদ সঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলেরও হিজোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্যকর । হুই সমান । জল চঞ্চল ; এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধা-  
গ্নিনিদিগের হৃদয়ও চঞ্চল । জলে দাগ-বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি ?

পুষ্করিণীর শ্রাম জলে স্বর্ণ রৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্রাম হইল—কেবল তাল গাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ভায় জলিতে লাগিল ।

সুন্দরী বলিল, “ভাই, সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না । চল বাড়ী যাই ।”

শৈবালিনী । কেহ নাই, ভীম, চুপি চুপি একটি গান গা : না ।

সু । দূর হ ! শাপ ! ঘরে চ ।

শৈ । ঘরে যাব না লো সই !

আমার মদনমোহন আস্চে ওই ।

হায় ! যাব না লো সই !

সু । মরণ আর কি ? মদনমোহন ত ঘরে বোসে, সেই থানে চল না ।

শৈ । তাঁরে বল গিয়া, তোমার মদনমোহিনী, ভীমার জল নীতল দেখিয়া ভুবিয়া মরিয়াছে ।

সু । নে এখন রজ রাধ । রাত হলো—আমি আর

দাঁড়াইতে পারি না। আবার আজ ক্ষেমির মা বল্‌ছিল এদিকে একটা গোরু এসেছে ।

শৈ। তাতে তোমার আমার ভয় কি ?

সু। আ মলো, তুই বলিস্ কি ? ওঠ, নহিলে আমি চলিলাম ।

শৈ। আমি উঠবো না—তুই যা ।

সুন্দরী রাগ করিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া কূলে উঠিল। 'পুনর্বার শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "হঁা ধো সত্য সত্য তুই কি এই সন্ধ্যাবেলা একা পুকুরঘাটে থাকিবি না কি ?"

শৈবলিনী কোন উত্তর করিল না ; অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল : অঙ্গুলিনির্দেশানুসারে সুন্দরী দেখিল পুকুরগীর অপর পারে, এক তালবৃক্ষতলে, সর্বনাশ ! সুন্দরী আর কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষিপ্ত করিয়া উর্দ্ধধামে পলায়ন করিল। পিতল কলস, গড়াইতে গড়াইতে ঢক ঢক শব্দে উদরস্থ জল উদগীর্ণ করিতে করিতে, পুনর্বার বাপীজলমধ্যে প্রবেশ করিল।

সুন্দরী তালবৃক্ষতলে একটি ইংরেজ দেখিতে পাইয়াছিল ।

ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিল না—হুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষ পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া আর্দ্র বসনে কবরী সমেত মন্তকের অর্দ্ধভাগ মাত্র আবৃত করিয়া প্রকুম্ভরাজীবরৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘ মধ্যে, অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্রামভরঙ্গে এই স্বর্ণকমল ফুটিল ।

সুন্দরী পলায়না গেল; কেহ নাই দেখিয়া ইংরেজ ধীরে ধীরে তালগাছের অন্তরালে অন্তরালে থাকিয়া, ঘাটের নিকট আসিল ।

ইংরেজ, দেখিতে অন্নবরক বটে। শুদ্ধ বা স্বচ্ছ কিছুই ছিল না। \* কেশ দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ ; চক্ষুও ইংরেজের পক্ষে কৃষ্ণাভ। পরিচ্ছদের বড় জাঁক জমক ; \* এবং চেন্ অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কারের কিছু পরিপাট্য ছিল।

ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া, জলের নিকট আসিয়া, বলিল,

\* “I come again fair lady.”

শৈবলিনী বলিল,

“আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না।”

“Oh—ay—that nasty gibberish—I must speak it I suppose. হুম্ again আয়া হায়।”

শৈব। কেন ? যমের বাড়ীর কি এই পৃথক ?

ইংরেজ না বুঝিতে পারিয়া কহিল, “কিয়া বোল্‌তা হায় ?”

শৈ। বলি, যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে ?

• ইংরেজ। যম ! John you mean ? হুম্ জন নহি, হুম্ লরেন্স্।

শৈ। ভাল, একটা ইংরেজি কথা শিখিলাম, লরেন্স্ অর্থাৎ বাদর।

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স্ কষ্টের কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। লরেন্স্ কষ্টের, পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রয়স্থল হইতে অশ্রমোচন করিয়া, তৎপূর্বে আরোহণ পূর্বক টিবিয়ট্ নদীর তীরস্থ পর্বতপ্রতিমাদি, সহিত শ্রুত গীতি শ্রবণ করিতে করিতে চলিলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল,



“সেই শীতল দেশের তুষাররাশির সদৃশ যে দেরি কষ্টেরের অগ্নয়ে  
বালাকালে অতিভূত হইয়াছিলাম, এখন সে স্বপ্নের মত।  
দেশভেদে কি কচিভেদ জন্মে ?” তুষারময়ী মেরি কি শিখারূপিণী  
উষ্ণ দেশের স্থলরীর তুলনায় ? বলিতে পারি না।”

কষ্টের চলিয়া গেলে শৈবলিনী ধীরে ধীরে জল কলস পূর্ণ  
করিয়া কুম্ভকক্ষে বসন্তপবনারূঢ় মেঘবৎ হৃদপদে গৃহে প্রত্যাগমন  
করিল। যথাস্থানে জল রাখিয়া শূয়াগৃহে প্রবেশ করিল।

তথায় শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর কঞ্চলাসনে উপবেশন  
করিয়া, নামাবলীতে কটিদেশের সহিত উভয় জাঁহু বন্ধন করিয়া  
মুৎপ্রদীপ সম্মুখে, তুলটে হাতে-লেখা পুতি পুড়িতেছিলেন।  
আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তাহার পর একশত দশ বৎসর  
অতীত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষ। তাঁহার আকার  
দীর্ঘ; তদুপযোগী দুলিষ্ঠ গঠন। মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত,  
তদুপরি চন্দন-রেখা।

শৈবলিনী গৃহপ্রবেশকালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন, ‘যখন  
ইনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন এত রাত্রি হইল, তখন কি বলিব ?’  
কিন্তু শৈবলিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, চন্দ্রশেখর কিছু বাললেন  
না। তখন তিনি ব্রহ্মহৃদের স্তত্রবিশেষের অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত  
ছিলেন। শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল।

তখন চন্দ্রশেখর চাহিয়া দেখিলেন, বাললেন, “আজি এত  
অসময়ে বিছাৎ কেন ?”

শৈবলিনী বলিল, “আমি ভাবিতেছি, না জানি আমার তুমি  
কত বকিবে।”

চন্দ্র । কেন বন্ধিব ?

শৈ । আমার পুষ্করঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাই ।

চন্দ্র । বটেও ত—এখন এলে না কি ? বিলম্ব হইল কেন ?

শৈ । একটা গোরা আসিয়াছিল । তা, সুন্দরী ঠাকুরঝি তখন ডাঙ্গায় ছিল, আমায় ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া আসিল । আমি জলে ডিলাম, ভয়ে উঠিতে পারিলাম না । ভয়ে একগলা জলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম । সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম ।

চন্দ্রশেখর অশ্রুমনে বলিলেন, “আর আসিও না”, এই বলিয়া আবার শাকরভাণ্ডে মনোনিবেশ করিলেন ।

রাত্রি অত্যন্ত গভীরা হইল । তখনও চন্দ্রশেখর, প্রমা, মায়া, ফোট, অপোকবেয়হ ইত্যাদি তর্কে নিবিষ্ট । শৈবলিনী প্রথামত, স্বাক্ষীর অন্ন ব্যঞ্জন, তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়া, আপনি আহাৰাদি করিয়া পুষ্কর শয্যোপরি নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । এ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের অসুস্থি ছিল—অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানালোচনা করতেন, অল্পরাতে আহাৰ করিয়া শয়ন করিতে পারিতেন না ।

সহসা সৌধোপরি হইতে পেচকের গভীর কণ্ঠ শ্রুত হইল । তখন চন্দ্রশেখর অনেক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া, পুষ্কর বাঁধিলেন । সে সকল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, আলম্ববশতঃ দণ্ডায়মান হইলেন । মুক্ত বাতায়নপথে, কৌমুদীপ্রকৃষ্ট প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল । বাতায়নপথে সন্নাগত চন্দ্রকিরণ স্পষ্ট সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নির্পতিত হইয়াছে । চন্দ্রশেখর প্রকৃত-

চিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চক্কর আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে ! তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ক্রীতিবিক্ষারিত নেত্রে, শৈবলিনীর অনিন্দ্য স্নন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড়কৃষ্ণ ক্রয়ুগতলে, মুদ্রিত পদ্মকোরক সদৃশ, লোচন-পদ্ম দুটি মুদিয়া রহিয়াছে ;—সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে, সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন । দেখিলেন, সুদ্র কোমল ফরপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে লুপ্ত হইয়াছে—যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে । মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে, সুকুমার রসপূর্ণ তানুলুরাগরক্ত ওষ্ঠাধর জ্বলন্ত করিয়া, মুক্তাসদৃশ দস্তশ্রেণী কিঞ্চিৎাত্র দেখা দিতেছে । একবার যেন, কি অশ্বখপু দেখিয়া স্থপ্তা শৈবলিনী জীবৎ হাসিল—যেন একবার, জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল । আবার সেই মুখমণ্ডল পূর্ববৎ সুবৃষ্টিসুস্থির হইল । সেই বিলাস-চাকলী-শুভ্র, সুবৃষ্টি-সুস্থির ষিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর প্রাক্কম মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল ।

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর সুবৃষ্টিসুস্থির মুখমণ্ডলের স্নন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন করিলেন । ভাবিলেন, “হার ! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি । এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রাধুশীলনে বাস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন অনিলাম কেন ? অনিরা আমি স্থখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই । কিন্তু শৈবলিনীর তাঁহাতে কি স্থখ ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অতুরাগ অসম্ভব—তাহা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাজ্ঞা নিবারণের সম্ভাবনা নাই । বিশেষ, আমি ত

সর্বদা আমার গ্রহ লুইয়া বিব্রত ; আমি শৈবলিনীর সুখ-কখন  
ভাবি ? আমার গ্রহগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি  
সুখ ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্তই ইহাকে  
বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল । এক্ষণে আমি কি করিব ?  
এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া  
রমণীমুখপন্ন কি এ জন্মের সারভূত করিব ? হি, হি, তাহা পারিব  
না । তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের  
প্রায়শ্চিত্ত করিবে ? এই সুকুমার কুসুমকৈ কি সতৃপ্ত ঘোবনভাণে  
দগ্ধ করিবার জন্তই বৃন্তচূত করিয়াছিলেন ?”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রশেখর আহ্বার করিতে  
ভুলিয়া গেলেন । ‘পরদিন প্রাতে মীর মুন্সীর নিকট, হইতে  
সংবাদ আসিল, চন্দ্রশেখরকে সন্ন্যাসদাবাদ দাইতে হইবে । নন্দা-  
বের কাজ আছে ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

— ০০ —

লরেন্স্ ফষ্টর ।

বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেসমের একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল । লরেন্স্ ফষ্টর তথাকার ফ্যাক্টর বা কুঠিওয়াল । লরেন্স্ অল্প বয়সে মেরি ফষ্টরের প্রণয়াকাজ্ঞায় হতাহ্বাস হইয়া, ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি স্বীকার করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন । এখনকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শারীরিক রোগ জন্মে, তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত । ফষ্টর অল্পকালেই সে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন । সুতরাং মেরির প্রতিমা তাঁহার মন হইতে দূর হইল । একদা তিনি প্রয়োজন বশতঃ বেদগ্রামে গিয়াছিলেন—ভীমা পুষ্করিণীর জলে প্রকুল গদ্যস্বরূপা শৈবলিনী তাঁহার নয়ন পথে পড়িল । শৈবলিনী গোরা দেখিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু ফষ্টর ভাবিতে ভাবিতে কুঠিতে ফিরিয়া গেলেন । ফষ্টর ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কটা চক্ষুর অপেক্ষা কাল চক্ষু ভাল, এবং কটা চুণের অপেক্ষা কাল চুল ভাল । অকস্মাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, সংসার-সমুদ্রে জ্বালোক তরঙ্গী স্বরূপ—সকলেরই সে আলয় গ্রহণ করা কর্তব্য—যে সকল ইংরেজ এদেশে আসিয়া পুরোহিতকে ফাঁকি দিয়া, বাঙ্গালি স্তন্যদুগ্ধকে এ সংসারে সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা মন্দ করেন না । অনেক

বাঙ্গালীর মেয়ে, ধনুলোতে ইংরেজ ভজিয়াছে,—শৈবলিনী কি ভজিবে না ? ফটর কুটির কারকুন্কে সঙ্গে 'কারিয়া আবার বেদ-  
গ্রামে আসিয়া বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন । কারকুন শৈব-  
লিনীকে দেখিল—তাহার গৃহ দেখিয়া আসিল ।

বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজু নামে ভর পায়, কিন্তু একটি  
একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখিতে চাইে । শৈব-  
লিনীর সেই দশা ঘটিল । শৈবলিনী, প্রথম প্রথম তৎকালের  
প্রচলিত প্রথা অনুসারে ফটরকে দেখিয়া উর্জ্বাসে পলাইত । পরে  
কেহ তাহাকে বলিল, “ইংরেজেরা মনুষ্য ধরিয়া সদা ভোজন  
করে না—ইংরেজ সত্যি আশ্চর্য্য জন্ত—একদিন চাহিয়া দেখিও ।”  
শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল—দেখিল, ইংরেজ তাহাকে ধরিয়া সদা  
ভোজন করিল না । সেই অবধি শৈবলিনী ফটরকে দেখিয়া  
পলাইত না—ক্রমে তাহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়া-  
ছিল । তাহাও পাঠক জানেন ।

অন্ততঃ শৈবলিনী ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । অন্ততঃ-  
কণে চন্দ্রশেখর তাহার পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন । শৈবলিনী  
যাহা, তাহা ক্রমে বলিব ; কিন্তু সেলাই হউক. ফটরের যত বিকল  
হইল ।

পরে অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে ফটরের প্রতি আজ্ঞা প্রচার  
হইল যে, “পুরন্দরপুরের কুঠিতে অত্র ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি  
শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে । তোমাকে কোন বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত  
করা যাইবে ।” যিনি কুঠিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এই  
আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ফটরকে সদাই  
কলিকাতা বাজা করিতে হইল ।

শৈবলিনীর রূপ কষ্টের চিত্ত অধিকার কুরিয়াছিল। দেখিলেন, শৈবলিনীর আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাকালার বাস করিতেন, তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভস্বরূপে অক্ষম, এবং পরাভবস্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্য পারিলাম না—নিরস্ত হওয়াই ভাল। এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্যে অধর্ম্ম আছে, ক্রান্তএব অকর্তব্য। যাহারা তাঁরতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের স্ত্রীর ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য-সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।

লরেন্স্ কষ্টের সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভস্বরূপ করিলেন না—বন্দীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম্মশঙ্ক লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি সাধ্যসাধ্যও বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন, “Now, or never !”

এই ভাবিয়া, ষৈ দিন কলিকাতার শাস্ত্রা-করিবেন, তাহার পূর্ব্বে রাত্রে সন্ধ্যার পর শিবিকা, বাহক, কুঠির কয়জন বরকন্দাজ লইয়া সশস্ত্র বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে বেদগ্রামবাসীরা সভয়ে শুনিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। চন্দ্রশেখর সে দিন গৃহে ছিলেন না, মুরশিদাবাদ হইতে রাজকর্ম্মচারীর সাদর নিমন্ত্রণ-পত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায়-গিয়াছিলেন—অদ্যাপি প্রত্যাগমন করেন নাই। গ্রাম-বাসীরা চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ এবং রোদনধ্বনি শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, চন্দ্রশেখরের বাড়ী ডাকাইতি হইতেছে—অমেক মশালের আলো। কেহ অগ্রসর

হইল না। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, বাড়ী লুটিয়া ডাকাইতেরা একে একে নির্গত হইল। \* বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, কয়েক জন বাহকে একখানি শিবিকা স্বন্ধে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ—সঙ্গে পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব! দেখিয়া সকলে সতর্ক নিকট হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

\* দস্যোগণ চলিয়া গেলে প্রতিবাসীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল, দ্রব্য সামগ্রী বড় অধিক অপচ্যুত হয় নাই—অধিকাংশই আছে। কিন্তু শৈবলিনী নাই। \* কেহ কেহ বলিল, “সে কোথায় লুকাইয়াছে, এখনই আসিবে।” প্রাচীরেরা বলিল, “আর আসিবে না—আসিলেও চন্দ্রশেখর তাঁহাকে আর ধরে লইবে না। যে পাকী দেখিলে, ঐ পাকীর মধ্যে সে গিয়াছে।”

বাহারা প্রত্যুশা করিতেছিল যে, শৈবলিনী আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বসিল। বসিয়া বসিয়া, নিদ্রার চুল্লিতে লগ্নিগল। চুলিয়া চুলিয়া, বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। শৈবলিনী আসিল না।

সুন্দরী নামে যে যুবতীকে আমরা প্রথম পরিচিতা করিয়াছি, সেই সকলের শেষে উঠিয়া গেল। \* সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী, শৈবলিনীর সখী। আবার তাঁহার কথা উল্লেখ করিতে হইবে \* বলিয়া এ স্থলে এ পরিচয় দিলাম।

সুন্দরী বসিয়া বসিয়া, প্রভাতে গৃহে গেল। গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

— ০০ —

## নাগিতানী।

কষ্টের স্বয়ং শিবিকাসমভিযাহারে লইয়া দূরবর্তিনী ভাগী-  
রথীর তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা স্নসজ্জিত ছিল।  
শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকায় হিন্দু দাস দাসী এবং  
গ্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। \* এখন আবার হিন্দু দাস দাসী  
কেন ?

কষ্টের নিজে অস্ত্র যানে কলিকাতায় গেলেন। তাঁহাকে শীঘ্র  
বাইতে হইবে—বড় নৌকার বাতাস ঠেলিতে ঠেলিতে সপ্তাহে  
কলিকাতায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শৈবলিনীর জন্ত  
স্ত্রীলোকের আরোহণোপযোগী যানের সুব্যৱস্থা করিয়া দিয়া তিনি  
যানান্তরে কলিকাতায় গেলেন। \*এমত শঙ্ক ছিল না যে,  
তিনি স্বয়ং শৈবলিনীর নৌকার সঙ্গে না থাকিলে, বেহ নৌকা  
আক্রমণ করিয়া শৈবলিনীর উদ্ধার করিবে। ইংরেজের নৌকা  
গুলিতে কেহ নিকটে আসিবে না। শৈবলিনীর নৌকা মুন্ডেরে  
বাইতে বলিয়া গেলেন।

অভ্যাতবাতোপিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া  
শৈবলিনীর সুবিন্দুতা তরঙ্গী উত্তরাভিমুখে চলিল—মৃদুনাদী  
বীচিশ্রেণী তর তর শব্দে নৌকাতলে \*গ্রহত হইতে লাগিল।  
তোমরা অস্ত্র শঠ, প্রবলক, ধূর্তকে যত পার বিশ্বাস করিও, কিন্তু  
অভ্যাতবায়ুকে বিশ্বাস করিও না। অভ্যাতবায়ু বড় মধুর ;—

চোরের মত পা টিপি টিপি আসিয়া, এখানে পদ্যটি, ওখানে  
 যুথিকা নাম, সেখানে সুগন্ধিবকুলের শাখা লইয়া ধীরে ধীরে  
 ক্রীড়া করে—কাহাকে গন্ধ আনিয়া দেয়, কাহারও নৈশ জঙ্-  
 মানি হরণ করে, কাহারও চিন্তাসন্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করে, যুবতীর  
 অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়।  
 তুমি নোকারোহী—দেখিতেছ এই ক্রীড়াশীল মধুরপ্রকৃতি প্রভাত-  
 বায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমাংসের নদীকে সুসজ্জিতা করিতেছে;  
 আকাশস্থ দুই একখানা অল্প কাল মেঘকে সরাইয়া রাখিয়া,  
 আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে, তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে মৃদু মৃদু  
 নাচাইতেছে; স্নানাবগাহননিরতা কামিনীগণের সঙ্গে একটু একটু  
 মিষ্ট রহস্য করিতেছে—নোকায় তলে প্রবেশ করিয়া তোমার  
 কাণের কাছে মধুর সংগীত করিতেছে। তুমি মনে করিলে, বায়ু  
 বড় ধীরপ্রকৃতি,—বড় গম্ভীরস্বভাব, বড় আঁড়শরশূল—আবার  
 সদানন্দ! সংসারে যদি সকলই এমন হয় ত, কিনা হয়! দে  
 নোকা খুলিয়া দে! রোদ্র উত্তিল—তুমি দেখিলে যে বীচিদ্বাজির  
 উপরে রোদ্র জলিতেছে, সে গুলি পূর্কোপেক্ষা একটু বড় বড়  
 হইয়াছে—রাজহংসগণ তাহার উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে;  
 গাত্রমার্জনে অগ্রমণা সুন্দরীদিগের মৃৎকলসী তাহার উপর স্থির  
 থাকিতেছে না, বড় নাচিতেছে; কখন কখন ঢেউগুলা স্পর্শ  
 করিয়; সুন্দরীদিগের কাঁধে চড়িয়া বসিতেছে; অপর যিনি তীরে  
 উঠিয়াছেন, তাঁহার চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে—মাখা  
 কুটিতেছে—বুঝি বলিতেছে,—“দেহি পদপল্লবমুদারং”! নিতান্ত  
 পক্ষে পায়ের একটু অলঙ্ক-রাগ লইয়া লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে।  
 ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে

অরুণোদয়ের কবিতার মত কাণে বিলাইয়া যায় না, আর সে তৈরবী রাগিনীতে কাণের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিবে বায়ুর বড় গর্জন বাড়িল—বড় হুহুকারের ঘট। তরঙ্গ সকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল—নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছড়াইতে লাগিল—কখন বা মুখ ফিরাইয়া দিল—তুমি ভাব বুঝিয়া পবন-দেবকে প্রণাম করিয়া, নৌকা তীরে রাখিলে।

শৈবলিনীর নৌকার দশা ঠিক এইরূপ ঘটিল। অল্প বেলা হইলেই বায়ু শ্রবল হইল। বড় নৌকা, প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না। রক্ষকেরা ভয়হাট্টা ঘাটে নৌকা রাখিল।

কণকাল পরে নৌকার কাছে, এক নাপিতানী আসিল। নাপিতানী মধবা, খাটো রান্নাপেড়ে শাড়ীপরা—শাড়ার রান্না দেওয়া আঁচলা আছে—হাতে আলতার চুপড়ী। নাপিতানী নৌকার উপর অনেক কাল কাল দাড়ী দেখিয়া কেঁমটা টানিয়া দিয়াছিল। দাড়ীর অধিকারিগণ অবাক হইয়া নাপিতানীকে দেখিতেছিল।

একটা চরে শৈবলিনীর পাক হইতেছিল—এখনও হিন্দুয়ানি আছে—একজন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল। একদিনে কিছু বিবি সাজা বান্ধ না। ফষ্টর জানিতেন যে, শৈবলিনী যদি না পল্লর, অথবা প্রাণত্যাগ না করে, তবে সে অবশ্য একদিন টেবিলে বসিয়া যখনকি পাক, উপাদেশ বলিয়া ভোজন করিবে। কিন্তু এখনই তাড়াতাড়ি কি? এখন তাড়াতাড়ি করিলে সকল ঝিক্ নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া ফষ্টর ভূঁতাদিগের

পরামর্শমতে শৈবলিনীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল, নিকটে একজন দাসী দাঁড়াইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল । নাপিতানী সেই দাসীর কাছে গেল, বলিল,

“হাঁ গা তোমরা কোথা থেকে আস্চ গা ?”

চাকরাণী রাগ করিল—বিশেষ সে ইংরেজের বেতন পায়—বলিল, “তোম্ তা কিরে মাগী ! আমরা হিন্দী, দিল্লী, মুক্তা থেকে আস্চি ।”

নাপিতানী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “বলি তা নয়, বলি আমরা নাপিত—তোমাদের নৌকার যদি মেয়ে ছেলে কেহ কামায় তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি ।”

চাকরাণী একটু নরম হইল । বলিল, “আচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি ।” এই বলিয়া সে শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল যে, তিনি আত্মা পরিবেন কি না । সে কারণেই হইউক, শৈবলিনী অত্মমনা হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, বলিলেন, “আত্মা পরিব ।” তখন রক্ষকদিগের অসুস্থি লইয়া, দাসী নাপিতানীকে নৌকার ভিতর পাঠাইয়া দিল । সে স্বয়ং পূর্বমত পাকশালার নিকট নিবৃত্ত রহিল ।

নাপিতানী শৈবলিনীকে দেখিয়া আর একটু ঘোমটা টানিয়া দিল । এবং তাহার একটি চরণ লইয়া আত্মা পরাইতে লাগিল । শৈবলিনী কিয়ৎকাল নাপিতানীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন । দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন,

“নাপিতানী তোমার বাড়ী কোথা ?”

নাপিতানী কথা কহিল না । শৈবলিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন; “ ”

“নাপিতানী তোমার নাম কি ?”

তথাপি উত্তর পাইলেন না ।

“নাপিতানী তুমি কাঁদচ ?”

নাপিতানী মুহু স্বরে বলিল, “না ।”

“হাঁ কাঁদচ ।” বলিয়া শৈবলিনী নাপিতানীর অবগুষ্ঠন ঘোচন করিয়া দিলেন । নাপিতানী বাস্তবিক কাঁদিতেছিল । অবগুষ্ঠন মুক্ত হইলে নাপিতানী একটু হাসিল ।

শৈবলিনী বলিল, “আমি আস্তে আস্তে চিনেছি । ‘আমার কাছে ঘোমটা । মরণ আর কি ? তা এখানে এলি কোথা হতে ?”

নাপিতানী আর কেহ নহে—সুন্দরী ঠাকুরঝি । সুন্দরী চক্কর জল মুছিয়া কহিল, “শীঘ্র যাও ! আমার এই শাড়ী পর, ছাড়িয়া দিও । এই আলতার চুপড়ী নাও । ঘোমটা দিয়া নোকা হইতে চলিয়া যাও ।”

শৈবলিনী বিম্মা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এলে কেমন কর্বে ?”

সু । কোথা হইতে আসিলাম—কেমন করিয়া আসিলাম—সে পরিচয়, দিন পালি ত এর পর দিব । তোমার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি । লোকে বলিল পাণ্ডী গঙ্গার পথে গিয়াছে । আমিও প্রাতে উঠিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া, হাঁটিয়া গঙ্গা-তীরে আসিলাম । লোকে বলিল বজরা উত্তরমুখে গিয়াছে । অনেক দূর, পা ব্যর্থ হইয়া গেল । তখন নোকা ভাড়া করিয়া তোমার পাছে পাছে আসিয়াছি । তোমার বড় নোকা—চলি নু, আমার ছোট নোকা, তাই শীঘ্র আসিয়া ধরিয়াছি ।

শৈ। একলা এলি কেমন করে ?

সুন্দরীর মুখে আসিল, “তুই কালামুখী সাংঘেবের পাখী চড়ে এলি কেমন করে ?” কিন্তু অসময় বুঝিয়া সে কথা বলিল না। বলিল,

“একলা আসি নাই। আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিকী একটু দূরে রাখিয়া, আমি নাপিতানি সাজিয়া আসিলাম।”

শৈ। তার পর?

সু। তার পর তুমি আমার এই শাড়ী পর, এই আলতার চুপড়ী নাও, ঘোমটা দিয়া নোকা হইতে নামিয়া চলিয়া যাও, কেহ চিনতে পারিবে না। তীরে তীরে যাইবে। ডিকীতে আমার স্বামীকে দেখিবে। নন্দাই বলিয়া লজ্জা করিও না—ডিকীতে উঠিয়া বসিও। তুমি গেলেই তিনি ডিকী খুলিয়া দিয়া তোমার বাড়ী লইয়া যাইবেন।

শৈবলিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে অজ্ঞাসা করিলেন, “তার পর তোমার দশা?”

সু। আমার জেতে ভাবিও না। বাঙ্গালার এমন ইংরেজ আসে নাই যে, সুন্দরী বামনীকে নোকার পুরিয়া রাখিতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী; আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাজি মধ্যে বাড়ী যাইব। বিপত্তিস্থলন মধুসূদন আমার ভরসা। তুমি আর বিলম্ব করিও না—তোমার নন্দাইয়ের এখনও আহার হয় নাই। আজ হবে কি না, তাও বলিতে পারি না।

শৈ। ভাল, আমি যেন গেলেম । গেলে, সেখানে আমার ঘরে নেবেন কি ?

সু। ইল—লো ! কেন নেবেন মা ? না মেওয়াটা প'ড়ে রয়েছে আর কি ?

শৈ। দেখ । ইংরেজে আমার কেড়ে এনেছে—আর কি আমার জাতি আছে ?

সুন্দরী বিস্মিতা হইয়া শৈবলিনীর মুখপানে চাহিয়া নিরী-  
কণ করিতে লাগিল । শৈবলিনীর প্রতি মর্মভেদী তীব্রদৃষ্টি  
করিতে লাগিল—ওষধিস্পৃষ্ট বিষধরের জ্বর গর্জিতা শৈবলিনী  
মুখ নত করিল । সুন্দরী কিঞ্চিৎ পরম্পরবে জিজ্ঞাসা করিল,  
“সত্যকথা বলি ?”

শৈ। বলিব ।

সু। এই গন্ধার উপর ?

শৈ। বলিব । তোমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, আমি  
বলিতেছি । সাহেবের সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই ।  
আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হইবেন না ।

সু। তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ করিবেন না,  
তাঁহাতে সন্দেহ করিও না । তিনি ধর্ম্মাত্মা, অধর্ম্ম করিবেন না,  
তবে আর মিছা কথায় সময় নষ্ট করিও না ।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিল । একটু কাঁদিল, চক্ষের  
জল মুছিয়া বলিল, “আমি যাইব—আমার স্বামীও আমার গ্রহণ  
করিবেন, কিন্তু আমার কলক কি কখন ঘুটিবে ?”

সুন্দরী কোন উত্তর করিল না । শৈবলিনী বলিতে লাগিল,  
“ইহার পর পাড়ার ছোট মেয়েগুলো আমাকে আব্দুল দিয়া

দেখাইয়া বলিবে কি না? যে, ঐ উহাকে ইংরেজে লইয়া গিয়াছিল? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন আমার পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহার অন্ত্রপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ী খাইতে আসিবে? যদি কখন কল্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন সুভাষাণ পুত্রের বিবাহ দিবে? আমি যে স্বধর্ম্মে আছি, এখন ফিরিয়া গেলে, কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? আমি ঘরে ফিরিয়া গিয়া কি প্রকৃত্তরে মুখ দেখাইব?”

সুন্দরী বলিল, “স্বহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটয়াছে—সে ত আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছু ক্রেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে,”

শৈ। কি সুখে? কোন্ সুখের আশার এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্ত ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু—

সু। কেন, স্বামী? এ নারী জন্ম আর কাহার জন্ত?

শৈ। সব উ জ্ঞান—

সু। জানি। জানি যে পৃথিবীতে যত পাণিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাণিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে ছলভ, তাহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কি না, বালকে যেমন খেলা ঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কি না, বিধাতা তাঁকে সংগড়িয়া রাক্তা দিয়া সাজান নাই—মাহুষ করিয়াছেন। তিনি ধন্যাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাণিষ্ঠা; তাঁকে তোমার মনে ধরিখে কেন? তুমি অনেক অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমার যেকোন ভালবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা ছলভ—অনেক পুণ্য-ফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা



পেয়েছিলে। তা থাক্ সে কথা দূর হোক—এখনকার সে কথা নয়। তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণ সেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? আমার রাগ হইতেছে।

শৈ। দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃ-মাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি।—নচেৎ কালী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব।—মৎস্ জলে ডুবিয়া মরিব। এখন মুন্সের বাইতেছি।—বাই, দেখি মুন্সের কেমন। দেখি, রাজধানীতে ভিক্ষা মিলে কি না। মরিতে হয় না হয় মরিব।—মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ নই আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর যেরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্ত এত ক্লেশ করিলে—কিরিয়া যাও। আমি খাইব না। মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও! তুমি যাও।

তখন সুন্দরী আর কিছু বলিল না।। রোদন সম্বরণ করিয়া গাত্রোখান করিল, বলিল, “ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে! দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়! মুন্সেরে বাইবার পূর্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়! ঝড়ে হোক, তুফানে হোক, নোকা ডুবিয়া হোক, মুন্সেরে পৌঁছবার পূর্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।”

এই বলিয়া, সুন্দরী নোকামধ্য হইতে নিজস্ব হইরা, আল-তার চূপড়ী জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, স্বামীকে নিকট প্রত্যাবর্তন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

—oo—

চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন ।

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন । দেখিয়া রাজকর্ম-চারীকে বলিলেন, “মহাশয় আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলোম না ।”

রাজকর্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন মহাশয় ?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “সকল কথা গণনায় স্থির হয় না । যদি হইত, তবে মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইত । বিশেষ জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী ।”

রাজপুরুষ বলিলেন, “অথবা রাজার অপ্রিয়, সংবাদ-বুদ্ধমান লোকে প্রকাশ করে না । যা হাই হউক, আপনি যেমন বলিলেন, আমি সেইরূপ রাজসমীপে নিবেদন করিব ।”

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন । রাজকর্মচারী তাঁহার পাথের দিতে সাহস করিলেন না । চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন—ভিক্ষা গ্রহণ করেন না—কাঁহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না ।

গৃহে ফিরিয়া আসিতে, দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন । দেখিবামাত্র তাঁহার মনে আহলাদের সঞ্চার হইল । চন্দ্রশেখর তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু । আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, বিদেশ হইতে আগমনকালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে

আহ্বাদেয় সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এত দিন আহার নিত্যর কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি অল্পে স্থখী হইব? এ বয়সে আমাকে গুরুতর মোহ-বন্ধে পড়িতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেমসী ভার্যা বাস করেন, এইজন্য, আমার এ আহ্বাদ? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাদিক্য—কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ! আমার যে তন্নী লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎকল্লকমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন? আমি ভগবতাকো অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতেওঁ ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব। কতক্ষণে আবার শৈবলিনীকে দেখিব?

অকস্মাৎ চন্দ্রশেখরের মনে অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল। যদি বাড়ী গিয়া শৈবলিনীকে না দেখিতে পাই? কেন দেখিতে পাইব না? যদি পীড়া হইয়া থাকে? পীড়া ত সকলেরই হয়—আরাম হইবে। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, পীড়ার কথা মনে হওয়াতে এত অস্থখ হইতেছে কেন? কাহার না পীড়া হয়? তবে যদি কোন কঠিন পীড়া হইয়া থাকে? চন্দ্রশেখর ক্রত চলিলেন। যদি পীড়া হইয়া থাকে, ঈশ্বর শৈবলীনীকে আরাম করিবেন, স্বস্তায়ন করিব। যদি পীড়া ভাল না হয়! চন্দ্রশেখরের চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, ভগবান্ আমায় এ বয়সে এ বড় দিয়া আবার কি বঞ্চিত করিবেন! তাহারই বা বিচিত্র কি—আমি কি

তাঁহার এতই অমুগ্ধীভূত যে, তিনি আমার কপালে মুখ বই, হুঃখ বিধান করিলেন না ? হয় ত ঘোরতর হুঃখ আমার কপালে আছে । যদি গিয়া দেখি শৈবলিনী মাই ?—যদি গিয়া শুনি যে, শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ? তাহা হইলে আমি বাঁচিব না । চন্দ্রশেখর অতি দ্রুতপদে চলিলেন । পল্লী-মধ্যে পহুছিয়া দেখিলেন, প্রতিবাসীরা তাঁহার মুখ প্রতি-গম্ভীর-ভাবে চাহিয়া দেখিতেছে—চন্দ্রশেখর সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিলেন নহ । বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চুপি চুপি হাসিল । কেহ কেহ দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাৎদর্শী হইল । প্রাচীনেরা তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল । চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—ভীত হইলেন—অশ্রমনা হইলেন—কেনে দিকে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । • •

দ্বার বন্ধ । বাহির হইতে দ্বার ঠেলিলে ভৃত্য বহির্দ্বারের দ্বার খুলিয়া দিল । চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া, ভৃত্য, কাঁদিয়া উঠিল । চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে ?” ভৃত্য কিছু উত্তর না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল ।

চন্দ্রশেখর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন । দেখিলেন উঠানে বাঁট পড়ে নাই,—চণ্ডীমণ্ডপে ধূলা । স্থানে স্থানে পোড়া মশাল—স্থানে স্থানে কবাট ভাঙ্গা । চন্দ্রশেখর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন সকল ঘরেরই দ্বার বাহির হইতে বন্ধ । দেখিলেন, পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়া, সরিয়া গেল । শুনিতে পাইলেন, সে বাটীর বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল । তখন চন্দ্রশেখর, প্রাঙ্গণমধ্যে দাঁড়াইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন,—

“শৈবলিনী !”

কেহ উত্তর দিল না.; চন্দ্রশেখরের বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়া রোদ্ধমানা পরিচারিকাও নিস্তব্ধ হইল ।

চন্দ্রশেখর আবার ডাকিলেন । গৃহনধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—কেহ উত্তর দিল না ।

ততক্ষণ শৈবলিনীর চিত্রিত তরণীবৃ উপর গঙ্গাধুসঙ্কারী মৃদু-পবন-হিলোলে, ইংরেজের লাল নিশান উড়িতেছিল—স্মৃতির সারি গারিতেছিল ।

চন্দ্রশেখর সকল হুনিলেন ।

তখন চন্দ্রশেখর সমস্ত গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা স্তূপের পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন । তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গাহস্থ্য দ্রব্যজাত দ্রিয়জ প্রতীবাসীদিগের ডাকিয়া বিতরণ করিলেন । সারাহকাল পর্যন্ত এই সকল কার্য্য করিলেন । সারাহকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয়, গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্র করিলেন । একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোন খানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রান্নীকৃত করিয়া সাজাইলেন । সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন ।

অগ্নি জ্বলিল । পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; শ্রী, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ, একে একে সকলই অগ্নিস্ফুট হইয়া

জলিতে লাগিল । বর্ষবহুসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত<sup>১</sup> সেই  
অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল ।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন<sup>২</sup> করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয়  
মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন । কোথায়  
গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না ।





দ্বিতীয় খণ্ড ।









## দ্বিতীয় খণ্ড ।

— ০০ —

পাপ ।

— ০০ —

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

কুলসম্ ।

“না, চিড়িয়া নাচিবে না । তুই এখন তোর গল্প বল্ ।”

দলনী বেগম, এই বলিয়া, যে ময়ূরটা নাচিল না, তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিল । আপনার হস্তের হীরকজড়িত বলয় খুলিয়া আর একটা ময়ূরের গলায় পরাইয়া দিল; একটা মূর্খর কাকীতুরার মুখে চোখে গোলাবের পিচকারী দিল । কাকীতুরা “বাদী” বলিয়া গালি দিল । এ গালি দলনী স্বয়ং কাকীতুরাকে শিখাইয়াছিল ।

নিকটে একজন পরিচারিকা পক্ষীদ্বিগকে নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিল, “এখন তোর গল্প বল্।”

কুলসুম্ কহিল “গল্প আর কি ? হাতিয়ার বোকাই হই খান। কিস্তি খাঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাতে একজন ইংরেজ চড়ন্যার ; সেই হই কিস্তি আটক হইয়াছে। আলিহিরা-  
তিম খাঁ বলেন যে, নোকা ছাড়িয়া দাও। উহা আটক করিলেই  
খামকা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে। গুরুগন্ খাঁ বলেন,  
লড়াই বাধে বাধুক। নোকা ছাড়িব না।”

দ। হাতিয়ার কোথায় যাইতেছে ?

কু। আজিমাবাদের\* কুঠিতে যাইতেছে। লড়াই বাধে  
ত আগে সেইখানে বাধিবে। সেখান হইতে ইংরেজেরা হঠাৎ  
যেদখল্ না হয় বলিয়া সেখা হাতিয়ার পাঠাইতেছে। এই কথা  
ত কেলাব মধ্যে রাষ্ট।

দ। তা গুরুগন্ খাঁ আটক করিতে চাহে কেন ?

কু। বলে, সেখানে এত হাতিয়ার জমিলে লড়াই ফতে  
করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে। আলি  
হিরাহিম খাঁ বলেন যে, আমরা বাহাই করি না কেন ইংরেজকে  
লড়াইয়ে কখন জিতিতে পারিব না। অতএব আমাদের লড়াই  
না করাই স্থির। তবে নোকা আটক করিয়া কেন লড়াই  
বাধাই ? ফলে সে সত্য কথা। ইংরেজের হাতে রক্ষা নাই।  
বুঝি নবাব সেরাজ-উদৌলার কাণ্ড আবার ঘটে !

দলনী অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিল।

পরে কহিল, “কুলসম্, তুই একটি দুঃসাহসের কাজ করতে পারিস্?”

কু। কি? ইলিস মাছ বেঁচে হুবে, না ঠাণ্ডা জলে নাইতে হবে?

দ। দূর। তামাসা নহে। টের পেলে পর আলিজা তোকে আমাকে হাতীর দুই পাখের তলে ফেলে দিবেন।

কু। টের পেলে ত? এত আতর গোলাপ সোনা রূপা চুরি করিলাম, কই কেহ ত টের পেলেনা! আমার মনে বোধ হয়, পুরুষ মানুষের চক্ষু কেবল মাথার শোভার্থ—তাহাতে দেখিতে পায় না। কৈ, পুরুষে মেয়ে মানুষের চাতুরী কখন টের পাইল, এমনও দেখিলাম না।

দ। দূর! আমি খোজা খান্সামাদের কথা বলি না। নবাব আলিজা অগ্র পুরুষের মত নহেন। তিনি না জানিতে পারেন কি?

কু। আমি না লুকাইতে পারি কি? কি করিতে হইবে?

দ। একবার গুরগন্ খাঁর কাছে একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে।

কুলসন্ বিষয়ে নীরব হইল। দলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলিস্?”

কু। পত্র কে দিবে?

দ। আমি।

কু। সে কি? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

দ। প্রায়।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে নীরব

দেখিয়া ময়ূর দুইটা আপন আপন বাসবুষ্টিতে অরোহণ করিল।  
কাকাতুরা অনর্থক চীৎকার আরম্ভ করিল। অস্তান্ত পক্ষীরা  
আহায়ে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরে কুলসন্ বলিল, “কাজ অতি সামান্য। এক  
জন খোজাকে কিছু দিলেই সে এখনই পত্র দিয়া আসিবে। কিন্তু  
এ কাজ বড় শক্ত। নবাব জানিতে পারিলে উভয়ে মরিব।  
বা হোক, তোমার কণ্ঠ তুমিই জান। আমি দাসী। পত্র দাও—  
আর কিছু নগদ দাও।”

পরে কুলসন্ পত্র লইয়া গেল। এই পত্রকে সূত্র করিয়া  
বিধাতা দলনী ও শৈলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গুরগন্ থাঁ।

যাহার কাছে দলনীর পত্র গেল, তাহার নাম গুরগন্ থাঁ।

এই সময় বাঙ্গালার যে সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুরগন্ থাঁ একজন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি জাতিতে আরমানি; ইম্পাহান তাঁহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে, তিনি পূর্বের বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণ-বিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকালমধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান নিক্ষেপ করা প্রস্তুত করাইলেন। তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল; তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্বপ্রকার ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাসেমের এমন ভরসা ছিল যে তিনি গুরগন্ থাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুরগন্ থাঁর আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল; তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাসেম কোন কণ্ঠ করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে একে কিছু বলিলে মীরকাসেম তাহা গুনিতেন না। ফলতঃ গুরগন্ থাঁ একটি ক্ষুদ্র

নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্য্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রাজি দ্বিতীয় প্রহর, কিন্তু গুরগন্ খাঁ শয়ন করেন নাই। একাকী দীপালোকে কতকগুলি পত্র পড়িতেছিলেন। সেগুলি কলিকাতাহু কয়েকজন আরমানির পত্র। পত্র পাঠ করিয়া, গুরগন্ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন। চোপ্দার আসিয়া দাঁড়াইল, গুরগন্ খাঁ কহিলেন,

“সব দ্বার খোলা আছে ?

চোপ্দার কহিল “আছে।”

গুর্। যদি কেহ এখন আমার নিকট আইসে—তবে কেহ তাহাকে বাধা দিবে না—বা জিজ্ঞাসা করিবে না, তুমি কে। এ কথা বুঝাইয়া দিয়াছ ?

চোপ্দার কহিল, “হুকুম তামিল হইয়াছে।”

গুর্। আচ্ছা তুমি তক্ষাতে থাক।

তখন গুরগন্ খাঁ পত্রাদি পাঠিয়া উপস্থিত স্থানে লুকায়িত করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “এখন কোন্ পথে যাই ? এই ভারতবর্ষ এখন সমুদ্র বিশেষ—যে যত ডুব দিতে পারিবে, সে তত রক্ত কুড়াইবে। তীরে বসিয়া ঢেউ গণিলে কি হইবে ? দেখ আমি গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—এখন আমার ভয়ে ভারতবর্ষ অস্থির ; আমিই বাঙ্গালার কর্তা। আমি বাঙ্গালার কর্তা ? কে কর্তা ? কর্তা ইংরেজ ব্যাপারী—তাহাদের গোলাম মীরকাসেম ; আমি মীরকাসেমের গোলাম—আমি কর্তার গোলামের গোলাম ! বড় উচ্চপদ ! আমি বাঙ্গালার কর্তা না হই কেন ? কে আমার ভোপের কাছে দাঁড়াইতে

পারে ? ইংরেজ ! একবার পেলে হয় । কিন্তু ইংরেজকে দশ হইতে দূর না করিলে, আমি কর্তা হইতে পারিব না । আমি বাজার অধিপতি হইতে চাহি—মীরকাসেমকে গ্রাহ্য করি না—যে দিন মনে করিব, সেই দিন উহাকে মস্‌নদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব । সে কেবল আমার উচ্চপদে আরোহণের সোপান—এখন ছাদে উঠিয়াছি—মই ফেলিয়া দিতে পারি । কষ্টকালকাল পাপ ইংরেজ ! তাহারা আমাকে হস্তগত করিতে চাহে—আমি তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চাহি । তাহারা হস্তগত হইবে না । অতএব আমি তাদের তাড়াইব । এখন মীরকাসেম মস্‌নদে থাক ; তাহার সহায় হইয়া বাজার হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব । সেই জন্তই উদ্যোগ করিয়া বুদ্ধ বান্ধাইতেছি । পশ্চাৎ মীরকাসেমকে বিদায় দিব । এই পথই সুপথ । কিন্তু আজি হঠাৎ এ পত্র পাটলাম কেন ? এ বালিকার এমন দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইল কেন ?”

বলিতে বলিতে যাহার কথা ভাবিতেছিলেন, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল । গুরুগন্থ খাঁ তাহাকে পৃথক আসনে বসাইলেন । সে দলনী বেগম ।

গুরুগন্থ খাঁ বলিলেন, “আজি অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম । তুমি নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা অবধি আর তোমাকে দেখি নাই ।” কিন্তু তুমি এ দুঃসাহসিক কর্ম কেন করিলে ?”

দলনী বলিল, “দুঃসাহসিক কিসে ?”

গুরুগন্থ খাঁ কহিল, “তুমি নবাবের বেগম হইয়া রাজ্য গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা



নবাব জানিতে পারিলে, তোমাকে আমাকে—ছই জনকেই বধ করিবেন ।”

দ। যদি তিনি জানিতেই পারেন, তখন আপনাতে আপনাতে যে সম্বন্ধ তাহা প্রকাশ করিব। তাহা হইলে রাগ করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না।

শুৰ্। তুমি বালিকা, তাই এমন ভয়না কবিতোছ! এত দিন আমরা এ সম্বন্ধ প্রকাশ কবি নাই। তুমি যে আমাদের চেন, বা আমি যে তোমাকে চিনি, এ কথা এ পর্যন্ত আমরা কেহই প্রকাশ করি নাই—এখন বিপদে পড়িয়া প্রকাশ করিলে কে বিশ্বাস করিবে? খালিবে, এ কেবল বাঁচবার উপায়। তুমি আসিয়া ভাল কথা কয় নাই।

দ। “নবাব জানিবার সম্ভাবনা কি? পাহারাওয়াল সকল আপনায় আঁজাকারী—আপনার প্রদত্ত নিদর্শন দেখিয়া তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। একটু কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি আসিয়াছি—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে এ কথা কি সত্য?

শুৰ্। এ কথা কি তুমি দুর্গে বসিয়া শুনিতে পাও না?

দ। পাউ। কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র যে, ইংরেজের সঙ্গে নিশ্চিত যুদ্ধ উপস্থিত। এবং আপনিই এ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন।

কন?

শুৰ্। তুমি বালিকা, তাহা কি প্রকারে বুঝিবে?

দ। আমি বালিকার মত কথা কহিতেছি? না বালিকার ক্ষমতা কাজ করিয়া থাকি? আমাকে যেখানে আব্রাহাম স্বরূপ নবাবের অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে বালিকা বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে?

গুর। হোক। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার আমার কতি  
কি? হয়, হউক না।

দ। আপনারা কি জয়ী হইতে পারিবেন?

গুর। আমাদের জয়েরই সম্ভাবনা।

দ। এ পর্য্যন্ত ইংরেজকে কে জিতিয়াছে?

গুর। ইংরেজেরা কম জন গুরগন্ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে?

দ। সেরাজ উদ্দৌলা তাহাই মনে করিয়াছিলেন। যাক—  
আমি স্বীকোঁক, আমার মন যাহা বুঝে, আমি তাই বিশ্বাস করি।  
আমার মনে হইতেছে যে কোন মতেই আমরা ইংরেজের সঙ্গে  
যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইব না। এ যুদ্ধে আমাদের সর্বনাশ হইবে।  
অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ যুদ্ধে প্ররতি  
দিবেন না।

গুর। এ সকল কথায় স্ত্রীলোকের পরামর্শ অগ্রাহ্য।

দ। আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিতে হইবে। আমার আপনি  
রক্ষা করুন। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। বলিয়া  
দলনী রোদন করিতে লাগিল।

গুরগন্ খাঁ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “তুমি কাঁদ কেন?  
না হয় মীরকাসেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে  
কবিয়া দেশে লইয়া যাইব।”

ক্রোধে দলনীর চক্ষু অলিয়া উঠিল। সক্রোধে তিনি বলি-  
লেন, “তুমি কি বিশ্বস্ত হইতেছ যে, মীরকাসেম আমার স্বামী।”

‘গুরগন্ খাঁ কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,  
“না বিশ্বস্ত হই নাই। কিন্তু স্বামী কারুরও চিরকাল থাকে  
না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে। আমার,

ভরসা আছে, তুমি একদিন তারতবর্ষের দ্বিতীয় সুরম্যাহান হইবে।”

দলনী ক্রোধে কম্পিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া উঠিল । গলদণ্ড নিরুদ্ধ করিয়া, লোচনযুগল বিস্ফারিত করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল,—

“তুমি নিপাত যাও ! অন্তঃকরণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া অন্যগ্রহণ করিয়াছিলাম—অন্তঃকরণে আমি তোমার সহায়-তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম ; জ্ঞানোন্মেষে যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম আছে, তাহা তুমি জান না । যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালই ; নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার সখ্যক নাই । সখ্যক নাই কেন ? আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রুসখ্যক । আমি জানিব যে, তুমিই আমার পরম শত্রু । তুমি জানও, আমি তোমার পরম শত্রু । এই রাজ্যান্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।”

এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন ।

দলনী বাহির হইলে গুরুগন্ধা চিন্তা করিতে লাগিলেন । বুঝিলেন, যে দলনী আর একগে তাঁহার নহে, সে মীরকাসেমের হইয়াছে । ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে স্নেহ করিলে করিতে পারে, কিন্তু সে মীরকাসেমের প্রতি অধিকতর স্নেহহীন । ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলার্থী বলিয়া যখন বুঝিয়াছে বা বুঝিবে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে । অতএব আর উহাকে হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে । গুরুগন্ধা ভ্রাতাকে ডাকিলেন ।

একজন শত্রুবাহক উপস্থিত হইল । গুরুগন্থা তাহার আরা  
আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনৌকে গ্রহরীরা-বেন দুর্গে প্রবেশ করিতে  
না দেয় ।

অস্বারোহণে দূত আগে দুর্গদ্বারে পৌছিল, দলনৌ যথাকালে  
দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া গুনিলেন, তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ  
হইরাছে ।

গুনিয়া দলনৌ ক্রমে ক্রমে, ছিন্নবস্ত্রীবৎ, ভূতলৈ বসিয়া পড়ি-  
লেন । চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল । বলিলেন, “ভাই,  
আমার দাড়াইবার স্থান রাখিলে নী” ।

কুলসম্ বলিল, “কিরিয়া সেনাপতির গৃহে চল ”

দলনৌ বলিল, “তুমি যাও । গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে আমার স্থান  
হইবে ।”

সেই অন্ধকার রাত্রে, রাজপথে দাড়াইয়া দলনৌ কাঁদিতে  
লাগিল । মাথার উপর নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—বৃক্ষ-হইতে প্রক্ষুট  
কুশুমের গন্ধ আসিতেছিল—ঈশ্বর পবনহিলোলে অন্ধকারাবৃত  
বৃক্ষপত্র সকল মঞ্চরিত হইতেছিল । দলনৌ কাঁদিয়া বলিল,  
“কুলসম্ !”

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

— ০০ —

দলনীর কি হইল।

একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে, নিশাকালে রাজমহিষী, রাজপথে দাড়াইয়া কাদিতে লাগিল। কুলসম জিজ্ঞাসা করিল, “এখন কি করিবেন?”

দলনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, “আইস, এই বৃক্ষতলে দাঁড়াই, প্রভাত হউক।”

কু। এখানে প্রভাত হইলে আমরা ধরা পড়িব।

দ। তাহাতে ভয় কি? আমি কোন্ হুমকি করিয়াছি যে, আমি ভয় করিব?

কু। আমরা চোরের মত পুরীত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি, তা তুমিই জান। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে, নবাবই বা কি মনে করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখ।

দ। বাহাই মনে করুন, জৈশ্বর আমার বিচার কর্তা—আমি অস্ত্র বিচার মানি না। না হয় মরিব, ক্ষতি কি?

কু। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে?

দ। এখানে দাঁড়াইয়া ধরা পড়িব—সেই উদ্দেশ্যেই এখানে দাঁড়াইব। ধৃত হওয়াই আমার কামনা। যে ধৃত করিবে, সে আমাকে কোথায় লইয়া বাইবে?

কু। দরবারে। “৬

দ। প্রভু কাহ্নে? আমি সেইখানেই বাইতে চাই । অত্যাচার আমার বাইবার স্থান নাই । তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরিবার কালে তাঁহাকে বলিতে পাইব যে, আমি নিরপরাধিনী । বরং চল, আমরা ছুর্গদ্বারে গিয়া বসিয়া থাকি—সেইখানে শীঘ্র ধরা পড়িব ।

এই সময়ে উভয়ে সন্মুখে দেখিল অন্ধকারে এক দীর্ঘাকার পুরুষ-মূর্ত্তি গজাভীরাভিমুখে যাইতেছে । তাহার বৃক্ষতলস্থ অন্ধকার মধ্যা গিয়া লুকাইল । পুনশ্চ 'সন্মুখে' দেখিল, দীর্ঘাকার পুরুষ গজার পথ পরিত্যাগ করিয়া "সেই আশ্রয়-বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিল । দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটী আবও অন্ধকার মধ্যে লুকাইল ।

দীর্ঘাকার পুরুষ সেইখানে আসিল । বলিল, "এখানে তোমরা কে?" এই কথা বলিয়া, সে যেন আপনা আপনি মূঢ়ত্বেরে বলিল, "আমার মত পথে পথে নিশা জাগরণ করে, এমন হতভাগা কে আছে?"

দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিয়া, স্ত্রীলোকদ্বয়ের ভয় জন্মিয়াছিল, কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয় দূর হইল । কণ্ঠ অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ার পরিপূর্ণ । কুলসম বলিল,

"আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে?" পুরুষ কাহ্নলেন, "আমরা ? তোমরা কয় জন?"

কু। আমরা দুইজন মাত্র ।

পু। এ রাত্রে এখানে কি করিতেছ ?

তখন দলনী বলিল, "আমরা হতভাগিনী—আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার কি হইবে?"

শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন, “অতি সামান্ত ব্যক্তি কর্তৃক লোকের উপকার হইয়া থাকে, তোমরা যদি বিপদগ্রস্ত হইয়া থাক—সাধ্যানুসারে আমি তোমাদের উপকার করিব।”

দ। আমাদের উপকার প্রায় অসাধ্য—আপনি কে ?

আগন্তুক কহিলেন, “আমি সামান্ত ব্যক্তি—দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। ব্রহ্মচারী।”

দ। আপনি যেই হউন, আপনার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে ডুবিয়া মরিতেছে, সে অবলম্বনেব যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করে না। কিন্তু যদি আমাদের বিপদ শুনিতে চান, তবে রাজপথ হইতে দূরে চলুন। রাত্রে কে কোথায় আছে এলা যায় না। আমাদের কথা সকলের সাক্ষাতে বলিবার নহে।

তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, “তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস।” এই বলিয়া দলনী ও কুলসম্মকে সঙ্গে করিয়া নগর-ভিমুখে চলিলেন। এক ক্ষুদ্র গহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে করাঘাত করিয়া “রামচরণ” বলিয়া ডাকিলেন। রামচরণ আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে আলো জালিতে আজ্ঞা করিলেন।

রামচরণ প্রদীপ জালিয়া, ব্রহ্মচারীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী তখন রামচরণকে বলিলেন, “তুমি গিয়া শয়ন কর।” শুনিয়া রামচরণ দলনী ও কুলসম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, রামচরণ সে রাত্রে আর নিদ্রা ঘাইতে পারিল না। ঠাকুরজী, এত রাত্রে দুইজন যুবতী স্বীলোক লইয়া আসিলেন কেন ? এই ভাবনা তাহার প্রবল

হইল । ব্রহ্মচারীকে . রামচরণ দেবতা মনে . করিত -- তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়াই জানিত -- সে বিশ্বাসের ঋণী হইল না । শেষে রামচরণ সিদ্ধান্ত করিল, “বোধহয়, এই দুই জন জীলোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে -- ইহাদিগকে সহমরণের প্রবৃত্তি দিবার জন্য ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন -- কি আলা, এ কথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না ।”

ব্রহ্মচারী একটা আসনে উপবেশন করিলেন . জীলোকেরা ভূমাসনে উপবেশন করিলেন । প্রথমে দলনী আত্মপরিচয় দিলেন । পরে দলনী রাত্রে ঘটনা সকল অক্ষপটে বিবৃত করিলেন ।

শুনিয়া ব্রহ্মচারী মনে মনে ভাবিলেন, “ভবিতব্য কে খণ্ডা-ইতে পারে ? যাহা ঘটবার তাহা অবশ্য ঘটিবে । তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্তব্য নহে । যাহা কর্তব্য, তাহা অবশ্য করিব ।”

হার ! ব্রহ্মচারী ঠাকুর ! গ্রন্থগুলি কেন পোড়াইলে ? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না । ব্রহ্মচারী দলনীকে বলিলেন, “আমার পরামর্শ” এই যে, আপনি অকস্মাৎ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না । প্রথমে, পত্রের দ্বারা তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করুন । যদি আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথাই তিনি বিশ্বাস করিবেন । পরে তাঁহার আজ্ঞা পাইলে সম্মুখে উপস্থিত হইবেন ।”

দ । পত্র লইয়া যাইবে কে ?

ব । আমি পাঠাইয়া দিব ।

তখন দলনী কাগজ কলম চাহিলেন । ব্রহ্মচারী রামচরণকে



আত্মার উঠাইলেন । রামচরণ কাগজ কুলম ইত্যাদি আনিয়া রাখিয়া গেল । দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন ।

ব্রহ্মচারী ততক্ষণ বলিতে লাগিলেন, “এ গৃহ আমার নহে ; কিন্তু যতক্ষণ না রাজ্যজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ এইখানেই থাকুন—কেহ জানিতে পারিবে না, বা কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না ।”

অগত্যা স্ত্রীলোকেরা তাহা স্বীকার করিল । লিপি সমাপ্ত হইলে, দলনী তাহা ব্রহ্মচারীর হস্তে দিলেন । স্ত্রীলোকদিগের অবস্থিতি বিষয়ে রামচরণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া ব্রহ্মচারী লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন ।

মুন্সীর যে সকল রাজকর্মচারী হিন্দু, ব্রহ্মচারী তাহাদিগের নিকটে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন । মুসলমানেরাও তাঁহাকে চিনিত । সুতরাং সকল কর্মচারীই তাঁহাকে মানিত ।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায়, ব্রহ্মচারীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন । ব্রহ্মচারী সূর্য্যোদয়ের পর মুন্সীর দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; এবং রামগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দলনীর পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন । বলিলেন, “আমার নাম করিও না ; এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও ।” মুন্সী বলিলেন “আপনি উত্তরের প্রান্ত কাল আসিবেন ।” কাহার পত্র তাহা মুন্সী কিছুই জানিলেন না । ব্রহ্মচারী পুনর্বার, পুষ্পবর্ণিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, “কল্য উত্তর আসিখে । কোন প্রকারে অন্য কাল যাপন কর ।”

রামচরণ প্রত্যাহা আসিয়া দেখিল, সহস্ররূপের কোন উদ্যোগ নাই ।

এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া  
আছেন । এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল । তাঁহার  
চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী  
পুণ্যময়ী হইবে ।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

#### প্রতাপ ।

সুন্দরী বড় রাগে করিয়াই শৈবলিনীর বজ্রা হইতে চলিয়া  
আসিয়াছিল । সমস্ত পথ স্বামীর নিকটে শৈবলিনীকে গালি  
দিতে দিতে আসিয়াছিল । কখনও “অভাগী”, কখনও “পোড়ার-  
মুখী”, কখনও “চুলোমুখী” ইত্যাদি প্রিয়-সম্বোধনে শৈবলিনীকে  
অভিহিত করিয়া স্বামীর কোতুক বর্ধন করিতে করিতে আসিয়া-  
ছিল । ধরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল । তার পর চন্দ্রশেখর  
আসিয়া দেশভাগী হইয়া গেলেন । তার পর কিছু দিন অমনি  
অমনি গেল । শৈবলিনীর রা চন্দ্রশেখরের কোন সংবাদ পাওয়া  
গেল না । তখন সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া গহনা পরিতে  
বসিল ।

পূর্বেই বলিয়াছি, সুনন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিকতা এবং সম্বন্ধে ভগিনী । তাঁহার পিতা নিতান্ত অসম্মতিশালী নহেন । সুনন্দরী সচরাচর পিতালয়ে থাকিতেন । তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ, প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখনও কখনও স্বস্তর বাড়ী আসিয়া থাকিতেন । শৈবলিনীর বিপদ কালে যে, শ্রীনাথ বেদগ্রামে ছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । সুনন্দরীই বাড়ীর গৃহিণী । তাঁহার মাতা কৃষ্ণ এবং অকর্ণগা । সুনন্দরীর আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল ; তাহার নাম রূপসী । রূপসী স্বস্তরবাড়ীতেই থাকিত ।

সুনন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া অলঙ্কার সন্নিবেশ পূর্বক পিতাকে বলিল, “আমি ‘রূপসীকে দেখিতে যাইব—তাঁহার বিষয়ে বড় কুসংগ দেখিয়াছি ।” সুনন্দরীর পিতা কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী কণ্ঠার বশীভূত, একটু আধটু আপত্তি করিয়া সম্মত হইলেন । সুনন্দরী, রূপসীর স্বস্তরালয়ে গেলেন—শ্রীনাথ স্বগৃহে গেলেন ।

রূপসীর স্বামী কে ? সেই প্রতাপ ! শৈবলিনীকে বিবাহ করিলে, প্রতিবাসিপুত্র প্রতাপকে চন্দ্রশেখর সর্বদা দেখিতে পাইতেন । চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন । সুনন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়ঃস্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন । কেবল তাহাই নহে । চন্দ্রশেখর, কাসেম আলি ‘খাঁর শিক্ষার তা’ ; তাঁহার কাছে বিশেষ প্রতিপন্ন । চন্দ্রশেখর, নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন । প্রতাপ রীর গুণে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন । এক্ষণে প্রতাপ জমিদার । তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা—এবং দেশ-বিখ্যাত নাম । সুনন্দরীর শিবিকা তাঁহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল ।

রূপসী তাঁহাকে দেখিয়া প্রশংসা করিয়া, সাদরে, গৃহে লইয়া গেল ।  
প্রতাপ আসিয়া স্ত্রীলীকে রহস্যসম্ভাষণ করিলেন ।

পরে অবকাশমতে প্রতাপ, সুনন্দরীকে বেদগ্রামের সকল  
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । অন্তান্ত কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা  
জিজ্ঞাসা করিলেন ।

সুনন্দরী বলিলেন, “আমি সেই কথা বলিতেই আসিয়াছি,  
বলি শুন ।”

এই বলিয়া সুনন্দরী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্দাসন-বৃত্তান্ত  
সবিস্তারে বিবৃত করিলেন । শুনিয়া, প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তম্ভ  
হইলেন ।

কিঞ্চিৎ পরে ঐ কথা তুলিয়া, প্রতাপ কিছু রূক্ষভাবে সুনন্দরীকে  
বলিলেন,

“এত দিন আমাকে এ কথা বলিয়া পাঠাই নাই কেন ?”

সু । কেন, তোমাকে বলিয়া কি হইবে ?

প্র । কি হইবে ? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই  
করিব না । আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে  
পারিত ।

সু । তুমি উপকার করিবে কি না, তা জানিব কি প্রকারে ?

প্র । কেন তুমি কি জান না—আমার শরৎ চন্দ্রশেখর  
হইতে ?

সু । জানি । কিন্তু শুনিয়াছি, লোকে বড়মানুষ হইলে  
পূর্বকথা তুলিয়া যায় ।

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া, অধীর এবং বাক্যশূন্য হইয়া উঠিয়া  
গেলেন । রাগ দেখিয়া সুনন্দরীর বড় আতঙ্কিত হইল ।

পূরদিন প্রতাপ এক পাচক ও এক ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া মুন্সেরে যাত্রা করিলেন । ভৃত্যের নাম রামচরণ । প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না । কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, “আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চালামাম ; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না ।”

যে গৃহে ব্রহ্মচারী দলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুন্সেরে সেই প্রতাপের বাসা ।

সুন্দরী কিছুদিন ভগিনীর নিকটে থাকিয়া, আকাজ্ঞা মিটাইয়া, শৈবলিনীকে গালি দিল । প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সারাহ্নে, সুন্দরী, রূপসীর নিকট প্রমাণ করিতে বসিত যে, শৈবলিনীর তুল্য পাপিষ্ঠা, হতভাগিনী আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই । এক দিন রূপসী বলিল,

“তা ত সত্য, তবে তুমি তার জন্ত দোড়াদোড়ি করিয়া মরিতেছ কেন ?”

সুন্দরী বলিল, “তঁার মুণ্ডপদ্ম করিব ব’লে—তঁাকে যমের বাড়ী পাঠাব ব’লে—তঁার মুখে আগুন দিব ব’লে” ইত্যাদি ইত্যাদি ।

রূপসী বলিল, “দিদি তুই বড় কুঁহনী !”

সুন্দরী উত্তর করিল, “সেই ত আমার কুঁহনী করেছে ।”

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

### গঙ্গাতীরে ।

কলিকাতার কোন্সিল হির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠান আবশ্যক। সেই জন্ত এক নৌকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন।

আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস সাহেবকে কিছু ঔষু উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। আমিরট সাহেব নবাবের সঙ্গে গোল বোগ মিটাউবার জন্ত যুদ্ধে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিসকে কোন প্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব একজন চতুর কর্মচারীকে তথায় পাঠান আবশ্যক হইল। সে আমিরটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে, এবং কলিকাতার কোন্সিলের অভিপ্রায় ও আমিরটের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।

এই সকল কার্যের জন্ত গবর্ণর বাগ্‌সিটাট্ কঠোরক পুরন্দরপুর হইতে আনিলেন। তিনি অস্ত্রের নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবেন, এবং আমিরটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাটনা যাইবেন। সুতরাং কঠোরকে কলিকাতায় আসিয়াই পশ্চিম যাত্রা করিতে হইল। তিনি এ সকল বৃত্তান্তের সংবাদ পূর্বেই পাইয়া-

ছিলেন, এজ্ঞ শৈবলিনীকে অগ্রেই মুক্তের পাঠাইয়াছিলেন ।  
কষ্টের পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন ।

কষ্টের অন্তের নোকা এবং শৈবলিনীর সহিত মুক্তের আসিয়া  
তীরে নোকা বাধিলেন । আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া  
বিদায় লইলেন, কিন্তু এমন সময়ে গুরগন্ খাঁ নোকা আটক  
করিলেন । তখন আমিয়টের সঙ্গে নবাবের বাদানুবাদ উপস্থিত  
হইল । অগ্ন আমিয়টের সঙ্গে কষ্টের এই কথা স্থির হইল  
যে, যদি নবাব নোকা ছাড়িয়া দেন ভালই ; নচেৎ কাল প্রাতে  
কষ্টের অন্তের নোকা ফেলিয়া পাটনার চলিয়া যাইবেন ।

কষ্টের দুইখানি নোকা মুক্তের ঘাটে বাধা । একখানি  
দেখী ভড়—আকারে বড় বৃহৎ—আর একখানি বজ্রা । ভড়ের  
উপর কয়েক জন নবাবের সিপাহী পাহারা দিতেছে । তীরেও  
কয়েক জন সিপাহী এই খানিতে অস্ত্র বোকাই—এই খানিই  
গুরগন্ খাঁ আটক করিতে চাহেন ।

বজ্রা খানিতে অস্ত্র বোকাই নহে । সেখানি ভড় হইতে  
হাত পক্ষাশ দূরে আছে । সেখানে কেহ নবাবের পাহারা নাই ।  
ছাদের উপর একজন “তেলিঙ্গা” নামক ইংরেজদিগের সিপাহী  
বসিয়া নোকা রক্ষণ করিতেছিল ।

রাত্রি সার্কি-দ্বিপ্রহর । অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু পরিষ্কার । বজ্র-  
র পাহারাওয়ালারা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে,  
একবার ঢুলিতেছে । তীরে একটা কসাড় বন ছিল । তাহার  
অস্ত্রাঙ্গে থাকিয়া এক ব্যক্তি কাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে ।  
নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায় ।

প্রতাপ রায় দেখিলেন, ঐহরী ঢুলিতেছে । তখন প্রতাপ

রায় আসিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলেন । প্রহরী জনের শব্দ পাইয়া তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করিল “হুমুদার ?” প্রতাপ রায় উত্তর করিলেন না । প্রহরী তুলিতে লাগিল । নৌকার ভিতরে ফষ্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়া ছিলেন । তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া, বজ্রার মধ্য হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন । দেখিলেন একজন জলে স্নান করিতে নামিয়াছে ।

এমন সময়ে কসাড় বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল । বজ্রার প্রহরী গুলির দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল । প্রতাপ তখন যেখানে নৌকার অঙ্ককার ছায়া পড়িয়াছিল, সেই খানে আসিয়া ওঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রহিলেন ।

বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র, ভড়ের সিপাহীরা “কিয়া হৈ রে ?” বলিয়া গোলযোগ করিয়া উঠিল । নৌকার অপরাপন্ন লোক জাগরিত হইল । ফষ্টর বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন ।

লরেন্স ফষ্টর বাহিরে আসিয়া চারিদিক ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । দেখিলেন তাঁহার “তেলিঙ্গা” প্রহরী অস্তহিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, তাহার মৃত দেহ ভাসিতেছে । প্রথমে মনে করিলেন, নবাবের সিপাহীরা মারিয়াছে—কিন্তু তখনই কসাড় বনের দিকে অগ্ন ধ্বংস দেখিলেন । আরও দেখিলেন, তাহার সঙ্গের দ্বিতীয় নৌকার লোক সকল বৃত্তান্ত কি জানিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে । আকাশে নক্ষত্র জলিতেছে ; নগরমধ্যে আলো জলিতেছে—গঙ্গাকূলে শত শত বৃহত্তরঙ্গী শ্রেণী, অন্ধকারে নিদ্রিতা স্বাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—কল কল রবে অনন্তপ্রবাহিণী গঙ্গা ধাবিতা হইতে—



ছেন। সেই স্রোতে প্রহরীর শব ভাসিয়া যাইতেছে। পলক-  
মধ্যে ফষ্টর এই সকল দেখিলেন।

কসাড় বনের উপর দ্রবস্বরল ধুমরেখা দেখিয়া, ফষ্টর স্বহস্ত-  
স্থিত বন্দুক উত্তোলন করিয়া সেই বনের দিকে লক্ষ্য করিতে-  
ছিলেন। ফষ্টর বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বনাস্তরালে  
লুকায়িত শত্রু আছে। ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, যে শত্রু অদৃশ্য  
থাকিয়া প্রহরীকে নিপাত করিয়াছিল, সে এখনই তাহাকেও  
নিপাত করিতে পারে। কিন্তু তিনি পলঙ্গীষ যুদ্ধেব পর  
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ; দেশী লোকে যে ইংরেজকে লক্ষ্য  
করিবে, এ কথা তিনি মনে স্থান দিলেন না। বিশেষ ইংবেজ  
হইয়া যে দেশী শত্রুকে ভয় করিবে—তাহার মৃত্যু ভাল। এই  
ভাবিয়া তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া বন্দুক উত্তোলন করিয়াছিলেন  
—কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে কসাড় বনের ভিতর অগ্নি শিখা জলিয়া উঠিল  
—আবার বন্দুকের শব্দ হইল—ফষ্টর মস্তকে আহত হইয়া, প্রহ-  
রীর জ্ঞান, গঙ্গাস্রোতোমধ্যে পড়িও হইলেন। তাহার হস্তস্থিত  
বন্দুক সম্মুখে নোকার উপরেই পড়িল।

প্রতাপ সেই সময়ে, কটি হইতে ছুরিকা নিক্ষেপিত করিয়া,  
বজ্রার বন্ধনরজ্জু সকল কাটিগেল। সেখানে জল অগ্ন, স্রোতঃ  
মন্দ বলিয়া নাকেরা নঙ্গর ফেলে নাই। ফেলিলেও লঘু-  
হস্ত, বলবান্ প্রতাপের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিল না। প্রতাপ এক  
লাফ দিয়া বজ্রার উপর উঠিলেন।

এই ঘটনাগুলি হর্ণনায় যে সময় লাগিয়াছে, তাহার শতাংশ  
সময় মধ্যেই সে সকল সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রহরীর পতন, ফষ্ট-  
রের বাহিরে আসা, তাহার পতন, এবং প্রতাপের নোকারোহণ,

এই সকলে যে সময় লাগিয়াছিল, ততক্ষণে দ্বিতীয় নৌকার লোকেরা বজ্রার নিকটে আসিতে পারে নাই । কিন্তু তাহারাও আসিল ।

আসিয়া দেখিল, নৌকা প্রতাপের কোশলে বাহির জলে গিয়াছে । একজন সঁতার দিয়া নৌকা ধরিতে আসিল, প্রতাপ একটা লগি তুলিয়া তাহার মস্তকে মারিলেন । সে ফিরিয়া গেল । আর কেহ অগ্রসর হইল না । সেই লগিতে জলতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রতাপ আবার নৌকা ঠেলিলেন । নৌকা বুরিয়া গভীর স্রোতোমধ্যে পড়িয়া বেগে পূর্বাভিমুখে ছুটিল ।

লগি হাতে প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, আর একজন “তেলিঙ্গা” সিপাহী নৌকার ছাদের উপর জাহ্নু পীতিয়া, বসিয়া বন্দুক উঠাইতেছে । প্রতাপ লগি ফিরাইয়া সিপাহীর হাতে উপর মারিলেন ; তাহার হাত অবশ হইল—বন্দুক পড়িয়া গেল । প্রতাপ সেই বন্দুক তুলিয়া লইলেন । ফটরের হুঁচুত বন্দুকও তুলিয়া লইলেন । তখন তিনি নৈকান্তিক সঙ্কলকে বলিলেন,

“শুন, আমার নাম প্রতাপ রায় । নবাবও আমাকে ভয় করেন । এই দুই বন্দুক আর লগির বাড়ী—বোধ হয় তোমাদের কয়জনকে একেলাই মারিতে পারি । তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে কাহাকেও কিছু বলিব না । আমি হালৈ যাইতেছি, দাঁড়ীরা সকলে দাঁড় ধরুক । আর আর সকলে যেখানে যে আছে, সেইখানে থাক । নড়িলেই মরিবে—নচেৎ শকা নাই ।”

এই বলিয়া প্রতাপ রায় দাঁড়ীদিগকে এক একটা লগির খোঁচা দিয়া উঠাইয়া দিলেন । তাহারা ভয়ে জড় সড় হইয়া দাঁড় ধরিল । প্রতাপ রায় গিয়া নৌকার হাল ধরিলেন । কেহ

আর কিছু বলিল না। নৌকা দ্রুতবেগে চলিল। ড়ের উপর হইতে দুই একটা বন্দুক হইল, কিন্তু কাহাকে লক্ষ্য করিতে হইবে, নক্ষত্রালোকে তাহা কিছু কেহ অবধারিত করিতে না পারাতে সে শব্দ তখনই নিবারণিত হইল।

তখন ড় হইতে জন কয়েক লোক বন্দুক লইয়া এক ভিক্সিতে উঠিয়া, বজ্রা ধরিতে আসিল। প্রতাপ প্রথমে কিছু বলিলেন না। তাহার নিকটে আসিলে, দুইটি বন্দুকই তাহা-দিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। দুই জন লোক আহত হইল। অবশিষ্ট লোক ত্রীত হইয়া, ড়ী ফিরাইয়া পলায়ন করিল।

কসাড় বনে লুক্কায়িত রামচরণ, প্রতাপকে নিকটক দেখিয়া এবং ড়ের সিপাহীগণ কসাড়বন খুঁজিতে আসিতেছে দেখিয়া, নীরে ধীরে সরিয়া গেল।

## ৯ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বজ্রাঘাত ।

সেই নৈশ-গঙ্গাবিচারিণী তরলী মধ্যে নিদ্রা হইতে জাগিল  
—শৈবলিনী ।

বজ্রার মধ্যে ছুটুটি কামরা—একটিতে ফটর ছিলেন, আর  
একটিতে শৈবলিনী এবং তাহার দাসী । শৈবলিনী এখনও  
বিবি সাজে নাই—পরণে কালাপেড়ে শাড়ী, হাতে বালা,  
পায়ে মল—সঙ্গে সেই পুরন্দরপুরের দাসী পার্বতী । শৈব-  
লিনী নিদ্রিতা ছিল—শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল—সেই  
ভীমা পুষ্করিণীর চারিপাশে জলসংস্পর্শপ্রার্থিশাখারাজিতে  
বাণীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত—শৈবলিনী যেন তাহাতে পদ  
হইয়া মুখ ভাসাইয়া রহিয়াছে । • সুরোবরের প্রান্তে যেন এক  
সুবর্ণনির্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একটা খেত শূকর  
বেড়াইতেছে । রাজহংস দেখিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য শৈব-  
লিনী যেন উৎসুক হইয়াছে ; কিন্তু রাজহংস তাহার দিক  
হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে । শূকর শৈবলিনীপদকে  
ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, রাজহংসের মুখ দেখা  
যাইতেছে না, কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধহুইতেছে যেন,  
ফটরের মুখের মত । শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে যাইতে  
চায়, কিন্তু চরণ স্থল হইয়া জলতলে বুদ্ধ হইয়াছে—তাহার  
গতিশক্তি রহিত । এদিকে শূকর বলিতেছে, “আমার কাছে

আইন, আমি হাঁস খরিয়া দিব।” প্রথম বন্ধুকের শব্দে শৈব-  
লিনীর নির্দ্বা ভাবিয়া গেল—তাহার পর প্রহরীর জর্লে পড়িবার  
শব্দ শুনিল। অসম্পূর্ণ—ভয় নির্দ্বার আবেশে কিছুকাল বৃষ্টিতে  
পারিল না। সেই রাজহংস—সেই শূকর মনে পড়িতে লাগিল।  
যখন আবার বন্ধুকের শব্দ হইল, এবং বড় গঙগোল  
হইয়া উঠিল, তখন তাহার সম্পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরের  
কামরায় আসিয়া দ্বার হইতে একবার দেখিল—কিছু বৃষ্টিতে  
পারিল না। আবার ভিতরে আসিল। ভিতরে আলো জলিতে-  
ছিল। পার্কতীও উঠিয়াছিল। শৈবলিনী পার্কতীকে জিজ্ঞাসা  
করিল,

“কি হইতেছে, কিছু বৃষ্টিতে পারিতেছ?”

পা। কিছু না। লোকের কথায় বোধ হইতেছে, নৌকার  
ডাকাত পড়িয়াছে—সাহেবকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমাদেরই  
পাপের ফল।

শৈ। সাহেবকে মারিয়াছে, তাতে আমাদের পাপের ফল  
কি? সাহেবেরই পাপের ফল।

পা। ডাকাত পড়িয়াছে—বিপদ আমাদেরই।

শৈ। কি বিপদ? এক ডাকাতেই সঙ্গে ছিলাম, না হয়  
আর এক ডাকাতেই সঙ্গে যাইব। যদি গোরা ডাকাতেই হাত  
এড়াইয়া কাণা ডাকাতেই হাতে পড়ি, তবে মন্দ কি?

এই বলিয়া, শৈবলিনী ক্ষুদ্র মন্তক হইতে পৃষ্ঠোপরি বিল-  
ম্বিত বেগী আন্দোলিত করিয়া, একটু হাসিয়া, ক্ষুদ্র পালঙ্কের  
উপর গিয়া বসিল। পার্কতী বলিল, “এ সময়ে তোমার হাসি  
আমার সহ হয় না।”

শৈবলিনী বলিল, “অসহ্য হয়, গলায় জল জ্বালাচ্ছে, ডুবিয়ে মর। আমার হাসির সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমি হাসিব। একজন ডাকাতকে ডাকিয়া আন না, একটু জিজ্ঞাসা পড়া করি।”

পার্কীতী রাগ করিয়া বলিল, “ডাকিতে হইবে না ; তাহারাই আপনায়াই আনিবে।”

কিন্তু চারিদিক কাল পর্যন্ত অতিবাহিত হইল, ডাকাত কেহ আসিল না। শৈবলিনী তখন হুঃস্থিত হইয়া বলিল, “আমাদের কি কপাল। ডাকাতেয়াও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না।” পার্কীতী কাঁপিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া, এক চরে লাগিল। নৌকা সেইখানে কিছুক্ষণ বাগিয়া রহিল। পরে, তথায় কয়েকজন লাঠিয়াল এক শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্রে অগ্রে রামচরণ।

শিবিকা, বাহকেরা চরের উপর রাখিল। রামচরণ বজ্রাঘাত উঠিয়া প্রতাপের কাছে গেল। পরে প্রতাপের উপদেশ পাইয়া সে কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। প্রথমে সে, পার্কীতীর মুখপ্রতি চাহিয়া শেষে শৈবলিনীকে দেখিল। শৈবলিনীকে বলিল, “আপনি আসুন।”

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে,—কোথায় বাইব?” রামচরণ বলিল, “আমি আপনার চাকর। কোন চিন্তা নাই--আমার সঙ্গে আসুন। সাহেব মরিয়াছে।”

শৈবলিনী নিঃশব্দে গাভোখান করিয়া, রামচরণের সঙ্গে আসিল। রামচরণের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে নামিল। পার্কীতী

সঙ্গে বাইতেছিল—রামচরণ তাহাকে শিঁধে ধরিল। পার্শ্বতী ভয়ে নোকার মধ্যেই রহিল, রামচরণ শৈবলিনীকে শিবিকা মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, শৈবলিনী শিবিকাক্রড়া হইলেন। রামচরণ শিবিকা সঙ্গে প্রতাপের গৃহে গেল।

তখনও দলনী এবং কুলসম্ সেই গৃহে বাস করিতেছিল। তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে বলিয়া, যেখানে তাহারা ছিল, সেখানে শৈবলিনীকে লইয়া গেল না। উপরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, রামচরণ আলো জালিয়া রাখিয়া শৈবলিনীকে প্রণাম করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদায় হইল।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কাহার বাড়ী?” রামচরণ সে কথা কানে তুলিল না।

রামচরণ আগনার বুদ্ধি ধরচ করিয়া শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে আনিয়া তুলিল, প্রতাপের সেরূপ অনুমতি ছিল না। তিনি রামচরণকে বলিয়া দিয়াছিলেন, পাকী জগৎশেঠের গৃহে লইয়া বাইও। রামচরণ পথে ভাবিল—“এ রাত্রে জগৎশেঠের ফটুক খোলা পাইব কি না? ঘাগ্রবানেরা প্রবেশ করিতে দিবে কি না? জিজ্ঞাসিলে কি পরিচয় দিব? পরিচয় দিয়া কি আমি খুনে বলিয়া ধরা পড়িব? সে সকলে কাজ নাই; এখন বাসায় যাওয়াই ভাল।” এই ভাবিয়া সে পাকী বাসায় আনিল।

এদিকে প্রতাপ পাকী চলিয়া গেল দেখিয়া, নোকা হইতে নামিলেন। গুঁর্ব্বোই সকলে তাঁহার হাতের বন্দুক দেখিয়া, নিস্তব্ধ হইয়াছিল—এখন তাঁহার লাঠিয়াল সহায় দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। প্রতাপ নোকা হইতে অরতরণ করিয়া আত্ম-গৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিলে,

শ্রামচরণ দ্বার ঘোচন করিল। শ্রামচরণ যে, তাঁহার আত্মার বিপরীত কার্য করিয়াছে, তাহা গৃহে আসিয়াই শ্রামচরণের নিকট শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, “এখনও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অগণেশের গৃহে লইয়া যাও। ডাকিয়া লইয়া আইস।”

শ্রামচরণ আসিয়া দেখিল,—লোকে শুনিয়া বিস্মিত হইবে—শৈবলিনী নিদ্রা যাইতেছেন। এ অবস্থায় নিদ্রা সম্ভবে না। সম্ভবে কি না তাহা আমরা জানি না,—আমরা যেমন ঘটনাছে, তেমনই লিখিতেছি। শ্রামচরণ শৈবলিনীকে আগরিতা না করিয়া প্রতাপের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “তিনি ঘুমাইতেছেন—যুম ভাঙ্গাইব কি?” শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত হইলেন—মনে মনে বলিলেন, চাণক্য পণ্ডিত লিখিতে ভুলিয়াছেন; নিদ্রা স্ত্রীলোকের ষোল গুণ। প্রকাশে বলিলেন, এত পীড়াপীড়িতে প্রয়োজন নাই। তুমিও, ঘুমাও—পরিশ্রমের একশেষ হইয়াছে।” আমিও এখন একটু বিশ্রাম করিব।

শ্রামচরণ বিশ্রাম করিতে গেল। তখনও কিছু রাত্রি আছে। গৃহ—গৃহের বাহিরে নগরী—সর্বত্র শব্দহীন, অন্ধকার। প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। আপন শরনকঙ্কাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন—দেখিলেন, পালকে শয়না শৈবলিনী। শ্রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে প্রতাপের শয়্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছে।

প্রতাপ জালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, খেত শূণ্য উপর কে নির্মল অক্ষুণ্ণিত কুম্মরাশি ছালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির খেত-বারি-বিস্তারের উপর কে



প্রহুদ-খেত-পদ্ম-রাশি, ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোবোহিনী স্থির শোভা। দেখিয়া, প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, বা ইন্দ্রিয়-বশ্রতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চক্ষু ফিরিল না এমন নহে—কেবল অজ্ঞমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের জায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতি সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী দিগ্ভা ঘান নাই—চক্ষু মুদ্রিয়া আপনায় অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন। চক্ষু নিম্নীলিত দেখিয়া, রামচরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, শৈবলিনী নিদ্রিতা। গাঢ় চিন্তা বশতঃ প্রতাপের প্রথম প্রবেশে পদধ্বনি শৈবলিনী শুনিতে গান নাই। প্রতাপ বন্ধুকটি হাতে করিয়া উপরে আসিয়াছিলেন। এখন বন্ধুকটি দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। কিছু অজ্ঞমনা হইয়াছিলেন—সাবধানে বন্ধুকটি রাখা হয় নাই; বন্ধুকটি রাখিতে পাড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিলেন—প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বলিলেন। তখন শৈবলিনী উঠেঃঃরে বলিলেন,

“এ কি এ ? কে তুমি ?”

এই বলিয়া শৈবলিনী পালকে মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

প্রতাপ লল আশিয়া, মুচ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিকন করিতে লাগিলেন—সে মুখ শিশি-নিষিক্ত-পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। জল, কেশগুচ্ছ সকল আর্দ্র করিয়া, কেশগুচ্ছ সকল ধুই করিয়া, ঝরিতে লাগিল—কেশ, পুদ্গাবলয় শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল।

‘ অচিরে শৈবলিনী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল । প্রতাপ দাঁড়াইলেন । শৈবলিনী, স্থিরভাবে বলিলেন, “কে তুমি ? প্রতাপ ? না কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ ?”

প্রতাপ বলিলেন, “আমি প্রতাপ ।”

শৈ । একবার নোকায় বোধ হইয়াছিল, যেন তোমার কণ্ঠ কানে প্রবেশ করিল । কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, সে ভ্রান্তি । আমি স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়াছিলাম, সেই কারণে ভ্রান্তি মনে করিলাম ।

এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈবলিনী নীরব হইয়া রহিলেন । শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থিরা হইয়াছেন দেখিয়া প্রতাপ বিনাবাক্যে গমনোদ্যত হইলেন । শৈবলিনী বলিলেন, “বাইওনা ।”

প্রতাপ অনিচ্ছাপূর্বক দাঁড়াইলেন । শৈবলিনী জিজ্ঞাসী করিলেন,

“তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?”

প্রতাপ বলিলেন, “আমার এইশ্বাস ।”

শৈবলিনী বস্তুতঃ সুস্থিরা হন নাই । হৃদয় মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাঁহার নথ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল—সর্বদা রোমাঞ্চিত হইয়াছিল । তিনি, আর একটু নীরব থাকিয়া, ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া পুনরপি বলিলেন,

“আমাকে এখানে কে আনিল ?”

প্র । আমরাই আনিয়াছি ।

শৈ । আমরাই ? আমরা কে ?

প্র । আমি আর আমার চাকর ।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ অত্যন্ত কষ্ট হইলেন, বলিলেন “তোমার মত পাগিষ্ঠার মুখদর্শন করিতে নাই। তোমাকে স্নেহের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম,—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে?”

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিলেন না—বিনীত ভাবে, প্রায় বাম্পগদগদ হইয়া বলিলেন, “যদি স্নেহের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।”

প্রতাপ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, বলিলেন, “তুও করিতাম—কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই; কিন্তু তোমার মরণই ভাল।”

শৈবলিনী কাঁদিল। পরে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল,—  
আমার গুরাই ভাল—কিন্তু অত্রে বাহা বলে বন্দুক—তুমি আমার এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দশা কাঁহা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্ত সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞান-শূন্য হইয়াছি? তোমার জন্ত। কাহার জন্ত দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্ত। কাহার জন্ত আমি গৃহধর্মের মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্ত। তুমি আমার গালি দিও না।”

প্রতাপ বলিলেন, “তুমি পাগিষ্ঠা, তাই তোমার গালি দিই। আমার দোষ! ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি

বেদাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলাম । তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—  
তোমার প্রবৃত্তির দোষ । তুমি পাগিষ্ঠা, তাই আমার দোষ  
দাও । আমি তোমার কি করিয়াছি ?”

শৈবলিনী গর্জিয়া উঠিল—বলিল, “তুমি কি করিয়াছ ? কেন  
তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আবার আমার দেখা  
দিয়াছিলে ? আমার ক্ষুণ্ণ নোংরা যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি  
কেন আমার সম্মুখে জ্বলিয়াছিলে ? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম,  
আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে ? আমি কেন তোমাকে  
দেখিয়াছিলাম ? দেখিয়াছিলাম, ত তোমাকে পাইলাম না কেন ?  
না পাইলাম, ত মরিলাম না কেন ? তুমি কি জান না, তোমারই  
রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল ? তুমি কি জান  
না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখনও তোমার  
পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছিলাম ? নহিলে ফষ্ট  
আমার কে ?”

তিনি প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি বৃশ্চিক-  
দষ্টের হার পীড়িত হইয়া, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন  
করিলেন ।

সেই সময়ে বহির্দ্বারে একটা বড় গোল উপস্থিত হইল ।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

### গল্‌ষ্টন ও জনসন্।

রামচরণ নোকা হইতে শৈবলিনীকে লইয়া উঠিয়া গেলে, এবং প্রতাপ নোকা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে তেলিঙ্গা সিপাহী প্রতাপের আঘাতে অবসন্ন হইয়া ছাদের উপরে বসিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে তটের উপর উঠিল। উঠিয়া, যে পথে শৈবলিনীর শিবিকা গিয়াছে, সেই পথে চলিল। অতিদূরে থাকিয়া শিবিকা লক্ষ্য করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে জাতিতে মুসলমান। তাহার নাম বকাউল্লা বাঁ। ক্লাইবের সঙ্গে প্রথম যে সেনা রঙ্গদেশে আসিয়াছিল, তাহার মাজাজ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া ইংরেজদিগের দেশী সৈনিকগণকে তখন বাঙ্গালাতে তেলিঙ্গা বলিত; কিন্তু এক্ষণে অনেক হিন্দুস্থানী হিন্দু ও মুসলমান ইংরেজ-সেনা-ভুক্ত হইয়াছিল। বকাউল্লার নিবাস, গাজিপুরের নিকট।

বকাউল্লা শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্য থাকিয়া, প্রতাপের বাসা পর্য্যন্ত আসিল। দেখিল যে শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। বকাউল্লা, তখন আমিয়ট সাহেবের কুঠিতে গেল।

বকাউল্লা তথায় আসিয়া দেখিল, কুঠিতে একটা বড় গোল পড়িয়া গিয়াছে। বজ্রার বৃত্তান্ত আমিয়ট সকল শুনিয়াছেন। তনিল আমিয়ট সাহেব বসিয়াছেন যে, যে অর্থ রাঁত্রেই অন্ত্যাচারী-

নিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমি'রট্ সাহেব তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন । বকাউল্লা তখন আমি'রট্ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল — তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিল, — বলিল যে, “আমি সেই দস্যুর গৃহ দেখাইয়া দিতে পারি ।” আমি'রট্ সাহেবের মুখ প্রফুল্ল হইল — কুণ্ঠিত ক্রীড়াক্ষু হইল — তিনি চারিজন সিপাহী এবং একজন নাএককে বকাউল্লার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন । বলিলেন যে, দুরাংগাদিগকে ধরিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস । বকাউল্লা কহিল, “তবে তুমি জন্ ইংরেজ সঙ্গে দিউন — প্রতাপ রায় সাক্ষাৎ ” সয়তান — এ দেশীয় লোক তাহাকে ধরিতে পারিবে না ।”

গল্‌ষ্টন্ ও জন্সন্ নামক দুইজন ইংরেজ আমায়তের আক্ৰামত বকাউল্লার সঙ্গে সশস্ত্রে চলিলেন ।

গমনকালে গল্‌ষ্টন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তুমি'সে বাকীর মধ্যে কখনও গিয়াছিলে ?”

বকাউল্লা বলিল, “না ।”

গল্‌ষ্টন্ জন্সন্কে বলিলেন,

“তবে বাতি ও দেশলাইও লও । হিন্দু তেল গোড়ায় না খরচ হইবে ।”

জন্সন্ পকেটে বাতি ও দীপশলাকা গ্রহণ করিলেন ।

তাঁহারা তখন, ইংরেজদিগের রণযাত্রার গভীর পদবিক্ষেপে রাজপথ বহিয়া চলিলেন । কেহ কথা কহিল না । পশ্চাৎ পশ্চাৎ চারিজন সিপাহী, নাএক ও বকাউল্লা টলিল । নগর-প্রহরীগণ পৃথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ভীত হইয়া সরিয়া দাড়াইল । গল্‌ষ্টন্ ও জন্সন্ সিপাহী লইয়া প্রতাপের বাসার

সুস্থে নিঃশব্দে আসিয়া, দ্বারে দ্বারে ঘুরে করাঘাত করিলেন—  
রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিতে আসিল ।

রামচরণ অদ্বিতীয় ভৃত্য । পাঁ টিপিতে, গা টিপিতে, তৈল মাখাইতে, সুশিক্ষিতহস্ত । বস্ত্রকুঞ্জে, অঙ্গরাগকরণে, বড় পটু । রামচরণের মত ফরাশ নাই—তাহার মত দ্রব্যাক্রোতা দুর্লভ । কিন্তু এ সকল সামান্ত গুণ । রামচরণ লাঠিবাঁজিতে মুরশিদাবাদ প্রদেশে প্রসিদ্ধ—অনেক হিন্দু ও যবন তাহার হস্তের গুণে ধরাশয়ন করিয়াছিল । বন্দুকে রামচরণ কেমন অদ্রাহনক্ষ্য এবং কিপ্রহস্ত, তাহার পরিচয় ফণ্ডরের শোণিতে গন্ধাজলে লিখিত হইয়াছিল ।

কিন্তু এ সকল অপেক্ষা রামচরণের আর একটি সময়োপ-  
যোগী গুণ ছিল—ধূর্ততা । রামচরণ শৃঙ্গালের মত ধূর্ত । অথচ  
অদ্বিতীয় প্রভূতর্ক এবং বিশ্বাসী ।

রামচরণ দ্বার খুলিতে আসিয়া ভাবিল, “এখন ছয়দ্বারে  
দেয় কে ? ঠাকুর মশাই ? বাধ হয় ; কিন্তু বাহোক একটা  
কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি—রাত্রিকালে না দেখিয়া ছয়দ্বার খোলা  
হইবে না ।”

এই ভাবিয়া রামচরণ নিঃশব্দে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ দ্বারের  
নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ শুনিতে লাগিল । শুনিল, ছই জনে  
অর্দ্ধটুংঘরে একটা বিকৃত ভাষায় কথা কহিতেছে—রামচরণ  
তাহাকে “ইণ্ডিল্ মিণ্ডিল্” বলিত—এখনকার লোকে বলে,  
ইংরেজি । রামচরণ মনে মনে বলিল, “রসো, বাবা ! ছয়দ্বার  
খুলি ত বন্দুক ছাতে করিয়া—ইণ্ডিল্ মিণ্ডিল্ বে বিশ্বাস করে,  
সে ডালা ।”

• রামচরণ আরও ভাবিল, “বুঝি একটা বন্দুকের কাজ নয়, কর্তাকেও ‘ডাকি ।’ এই ভাবিয়া রামচরণ প্রতাপকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে দ্বার হইতে ফিরিল ।

এই সময়ে ইংরেজদিগেরও ধৈর্য্য ফুরাইল । জন্সন বলিল, “অপেক্ষা কেন, লাথি মার, ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজি লাথিতে টিকিবে না ।”

গল্ফট্‌ন লাথি মারিল । দ্বার, খড়্ খড়্, ছড়্ ছড়্, বন্ বন্ করিয়া উঠিল । রামচরণ দৌড়িল । শব্দ প্রতাপের কানে গেল । প্রতাপ উপর হইতে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন । সেবার কবাট ভাঙ্গিল না ।

পরে জন্সন লাথি মারিল । কবাট ভাঙ্গিয়া পাড়িয়া গেল ।

“এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক ।” বলিয়া ইংরেজেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীগণ প্রবেশ করিল ।

সিঁড়িতে রামচরণের সঙ্গে প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল । রামচরণ চুপি চুপি প্রতাপকে বলিল, “অন্ধকারে লুকাও—ইংরেজ আসিয়াছে—বোধ হয় আম্‌বাতের কুঁঠি থেকে ।” রামচরণ আমিয়টের পরিবর্তে আমবাত বলিত ।

প্র । ভয় কি ?

রা । আট জন লোক ।

প্র । আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এই বাড়ীতে যে কয় জন জীলোক আছে তাহাদের দশা কি হইবে ! তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস ।

রামচরণ যদি ইংরেজদিগের বিশেষ পরিচয় জানিত, তবে



প্রতাপকে কখনই লুকাইতে বলিত না। তাহার। যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, ততক্ষণে সহসা গৃহ আলোকে পূর্ণ হইল। জনসন্ আলিতবর্তিকা একজন সিপাহীর হস্তে দিলেন। বর্তিকার আলোকে ইংরেজের। দেখিল সিঁড়ির উপর দুই জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। জনসন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কেমন, এই?”

বকাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিল না। অন্ধকার রাতে সে প্রতাপ ও রামচরণকে দেখিয়াছিল—সুতরাং তাল চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ভগ্ন হস্তের যাতনা অসহ্য হইয়াছিল—যে কেহ তাহার দায়ে দায়ী। বকাউল্লা বলিল—“হাঁ ইহা-রাই বুটে।” -

তখন ব্যস্তের মত লোক দিয়া ইংরেজের। সিঁড়ির উপর উঠিল। সিপাহীর। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল দেখিয়, রামচরণ উজ্জ্বল প্রতাপের বন্দুক আনিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

জনসন্ তাহা দেখিলেন, -নিজ হস্তের পিস্তল উঠাইয়া রামচরণকে লক্ষ্য করিলেন। রামচরণ, চরণে আহত হইয়া, চলিবার শক্তি রহিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ নিরস্ত্র, পলায়নে অনিচ্ছুক, এবং পলায়নে রামচরণের যে দশা ঘটিল তাহাও দেখিলেন। প্রতাপ ইংরেজদিগকে স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তোমরা কে? কেন আসিয়াছ?” গল্টন্ প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?”

প্রতাপ বলিলেন, “আমি প্রতাপ রায়।”

সে নাম বকাউল্লার মনে ছিল। বজরার উপর বন্দুক

হাতে প্রতাপ গৰ্জ্জনের বাণীরাছিলেন, “ভূমি, আমার নবম প্রতাপ রায়।” বকাউল্লা বলিল, “জ্ঞাব্‌, এই ব্যক্তি মরদার।”

জনসন্‌, প্রতাপের এক হাত ধরিল, গল্ফট্‌ন আর এক হাত ধরিল। প্রতাপ ক্ষিপ্রলেন, বলপ্রকাশ অনর্থক। নিঃশব্দে সকল সহ্য করিলেন। নাএকের হাতে হাতকড়ি ছিল, প্রতাপের হাতে লাগাইয়া দিল। গল্ফট্‌ন পতিত রামচরণকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুটা ?” জনসন্‌ ছুইজন সিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন যে, “উহাকেও লইয়া আইস।” ছুইজন সিপাহী রামচরণকে টানিয়া লইয়া চলিল।

এই সকল গোলযোগ শুনিয়া দলনী ও কুলসন্‌ জাগরিত হইয়া মহা তর পাইয়াছিল। তাহারা কক্ষস্থর ঈশ্বর্য্য মূর্ত্তি করিয়া এই সকল দেখিতেছিল। সিঁড়ির পাশে তাহাদের শয়নগৃহ।

যখন ইংরেজেরা, প্রতাপ ও রামচরণকে লইয়া নীমিতে- ছিলেন, তখন সিপাহীর করস্থ দীপের আলোক, অকস্মাৎ ঈশ্বর্য্য ভাষাপথে, দলনীর নীলমণিগ্রীভ চক্ষুর উপর পড়িল। বকাউল্লা সে চক্ষু দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল,

“ফট্‌র সাহেবের বিবি!” গল্ফট্‌ন জিজ্ঞাসা করিলেন, “সত্যও ত! কোথায়?”

বকাউল্লা পূর্ব্বকথিত দ্বার দেখাইয়া কহিল, “ঐ ঘরে।”

জনসন্‌ ও গল্ফট্‌ন ঐ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলনী এবং কুলসন্‌কে হৃদয়িতা বলিলেন,

“তোমরা আমাদের সঙ্গে আইল।”

দলনী ও কুর্সম্ মহা ভীতা এবং লুণ্ঠবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনীই একা রহিল । শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিল ।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

#### পাপের বিচিত্র গতি ।

যেমন যবন কতারা অন্ন দ্বার গুলিয়া, আপনাদিগের শয়ন-গৃহ হইতে দেখিতেছিল, শৈবলিনীও সেইরূপ দেখিতেছিল । তিন জনই স্বীলোক, স্ততরাং স্ত্রীজাতিশুলভ কুতূহলে তিন জনেই পৌড়িতা ; তিন জনেই ভয়ে কাতরা ; ভয়ের স্বধর্ম ভয়ানক বল্লর দর্শন পুনঃপুনঃ কামনা করে । শৈবলিনীও আদ্যোপান্ত দেখিল । সকলে চলিয়া গেলে, গৃহমধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া শয্যোপরি বসিয়া শৈবলিনী চিন্তা করিতে লাগিল ।

ভাবিল “এখন কি করি ? একা, তাহাতে আমার ভয় কি ? পৃথিবীতে আমার ভয় নাই । মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ নাই । যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয় ? কেন আমার সেই মৃত্যু হয় না ? আত্মহত্যা বড় সহজ—সহজই বা কিসে ? এত দিন জলে বাস করিলাম, কই এক দিনও ডুবিয়া মরিতে পারিলাম না । রাতে যখন সকলে ঘুমাইত

বীরে বীরে নৌকার বাদ্বিরে আসিয়া, জলে কাঁপ দিলে কে ধরিত ?  
 ধরিত—নৌকার পাহারা থাকিত । কিন্তু আমিও ত কোন  
 উত্তোগ করি নাই । মরিতে বাসনা, কিন্তু মরিবার কোন উত্তোগ  
 করি নাই ।—তখনও আমার আশা ছিল—আশা থাকিতে  
 মানুষে মরিতে পারে না । কিন্তু আজ ? আজ মরিবার দিন  
 বটে । তবে প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে—প্রতাপের কি  
 হয়, তাহা না জানিয়া মরিতে পারিব না । প্রতাপের কি হয় ?  
 না হোক না, আমার কি ? প্রতাপ আমার কে ? আমি তাহার  
 চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে ? কে, তাহা জানি না—সে  
 শৈবলিনী-পতঙ্গের জলন্ত বহি—সে এই সংসার প্রান্তরে আমার  
 পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিছাৎ—সে আমার মৃত্যু ? আমি কেন  
 গৃহ ত্যাগ করিলাম, স্নেহের সঙ্গে আসিলাম ? কেন স্নানার্থী  
 সঙ্গে ফিরিলাম না ?”

শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ  
 করিতে লাগিল । বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল । যেখানে  
 প্রাচীরপার্শ্বে, শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল  
 —সেই করবীর সর্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্ত পুষ্প  
 ধারণ করিয়া, নীলাকাশকে আকাজ্ঞা করিয়া দুলিত, কখনও  
 তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল ।  
 তুলসী-মঞ্চ—তাহার চারি পার্শ্বে পরিষ্কৃত স্মার্কিত ভূমি, গৃহ-  
 পালিত মার্জার, পিঞ্জরে ফুটবাক্ পক্ষী, গৃহপার্শ্বে সুবাহু  
 আশ্রের উচ্চ বৃক্ষ—সকল স্বর্ণপটে চিত্রিত হইতে লাগিল । কত  
 কি মনে পড়িল ! কত স্মরণ, স্মরণ, স্মরণ আকাশ, শৈব-  
 লিনী ছাদে বসিয়া দেখিতেন ; কত স্মরণ প্রফুটিত খবর কুসুম

পরিষ্কার জলসিক্ত করিয়া, চন্দ্রশেখরের পুজার জন্ত গুলপাত  
 ভরিয়া রাখিয়া দিতেন ; কত স্নিগ্ধ, মন্দ, সুগন্ধি বায়ু, ভীমাতটে  
 সেবন করিতেন ; জলে কত ক্ষুদ্র তরঙ্গে ফাটিক বিক্ষেপ দেখি-  
 তেন, তাহার ভীরে কত কোকিল ডাকিত । শৈবলিনী আবার  
 নিখাস ভাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “মনে করিয়াছিলাম,  
 গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব ; মনে করিয়াছিলাম,  
 আবার পুরন্দরপুরের কুঠিতে ফিরিয়া যাইব—প্রতাপের গৃহ এবং  
 পুরন্দরপুর নিকট ; কুঠির বাতায়নে বসিয়া, কটাক জাল  
 পাতিয়া প্রতাপ পক্ষীকে ধরিব । সুবিধা বুঝিলে সেখান হইতে  
 ফিরিকীকে কঁাকি দিয়া পলাইয়া যাইব—গিয়া প্রতাপের পদ-  
 তলে কুঠাইয়া পড়িব । আমি পিঞ্জরের পক্ষী, সংসারের গতি  
 কিছুই জানিতাম না । জানিতাম না যে মনুষ্যে গড়ে, বিধাতা  
 ভাঙ্গে ; জানিতাম না যে ইংরেজের পিঞ্জর লোহার পিঞ্জর—  
 আমার সাধ্য কি ভাঙি । অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি  
 হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম ।” পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর  
 এ কথা মনে পড়িল না যে, পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা  
 কি ? বরং অনর্থকতাই ভাল । বিস্তৃত এক দিন সে এ কথা  
 বুঝিবে ; এক দিন প্রায়শ্চিত্ত জন্ত সে অস্থি পর্যন্ত সমর্পণ করিতে  
 প্রস্তুত হইবে । সে আশা না থাকিলে, আমরা এ পাপ চিত্রের  
 অবতারণা করিতাম না । সে ভাবিতে লাগিল, “পরকাল ?  
 সে ত যে দিন প্রতাপকে দেখিয়াছি, সেই দিন গিয়াছে । বিনি  
 অন্তরীক্ষী তিনি, সেই দিনেই আমার কপালে নরক লিখিয়া-  
 ছেন । ইহকালেও আমার নরক হইয়াছে—আমার মনই নরক  
 —নহিলে এত দুঃখ পাইলাম কেন ? নহিলে দুই চক্ষের বিষ

কিরিণীর সঙ্গে এতকাল বেড়াইলাম কেন ? তুমি কি তাই, বোধ হয়, বাহা কিছু আমার ভাল, তাহাওঁই অগ্রি লাগে । বোধ হয় আমারই জন্ত প্রত্যপ এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছে,—আমি কেন মরিলাম না ?”

শৈবলিনী আবার কাঁদিতে লাগিল । অগ্নেক পরে চক্ষু মুছিল । ক্র কুঞ্চিত করিল ; অধর নংশন করিল ; অগ্নকাল জন্ত তাহার প্রফুল্ল রাজীবতুলা মুখ, কষ্ট সর্পের চক্রের ভীমকান্তি শোভা ধারণ করিল । সে আবার বলিল, “মরিলাম না কেন ?” শৈবলিনী সহসা কটি হইতে একটু “গোঁড়” বাহির করিল । তন্মধ্যে ভীক্ধার ক্ষুদ্র ছুরিকা ছিল । শৈবলিনী ছুরিকা গ্রহণ করিল । তাহার কুলক নিকোষিত করিয়া, অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তৎ-সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল । বলিল, “বুঝা কি এ ছুরি সংগ্রহ করিয়াছিলাম ? কেন এত দিন এ ছুরি আমার এ পোড়া বুকৈ বসাই নাই ? কেন,—কেবল আশায় মজিয়া । এখন ?” এই বলিয়া শৈবলিনী ছুরিগ্রভাগ হৃদয়ে স্থাপিত করিল । ছুরি সেই ভাবে রহিল । শৈবলিনী ভাবিতে লাগিল, “আর একদিন ছুরি এইরূপে নিদ্রিত কষ্টরের বকের উপর ধরিয়াছিলাম । সে দিন তাহাকে মারি নাই, সাহস হয় নাই ; আজিও আত্মহত্যার সাহস হইতেছে না । এই ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরেজও বশ হইয়াছিল—সে বুঝিয়াছিল যে, সে আমার কামরায় প্রবেশ করিলে, এই ছুরিতে হয় সে মরিবে, নয় আমি মরিব । দুরন্ত ইংরেজ ইহার ভয়ে বশ হইয়াছিল,—আমার এ দুরন্ত হৃদয় ইহার ভয়ে বশ হইল না । মরিব ? না—আজ নহে । মরি, ত সেই বেদপ্রায়ে গিয়া মরিব । স্মরণীকে বলিব, যে, আমার জাতি

নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তাঁর পর মরিব।<sup>১</sup> আর তিনি—যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃষ্টিকে দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুন জলে। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি, বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাত্ত কি তাঁর কোন ক্রেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ কবির'ছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁতিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্ত দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়; সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখনও ভালবাসি নাই—কখনও ভালবাসিতে পারি'ব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্রেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফঠের মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথার কে বিশ্বাস করিবে?<sup>২</sup> শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিয়া, সেইরূপ চিন্তাভিত্ত রহিল। এভাতকালে তাঁহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কুশল দেখিল। যখন তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে—মুক্ত গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে রোদ্র প্রবেশ করিয়াছে। শৈবলিনী চক্ষু স্ফীলন করিল। চক্ষু স্ফীলন করিয়া সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইল! দেখিল

চন্দ্রশেখর !

## ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ।

— ୦୦ —







## তৃতীয় খণ্ড ।

— ০০ —

পুণ্যের স্পর্শ ।

— ০০ —

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

রমানন্দ স্বামী ।

মুজেরের এক ঘাটে, এক জন পরমহংস কিরাদিবস বসতি করিতেছিলেন । তাঁহার নাম রমানন্দ স্বামী । সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে বিনীত ভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন । অনেকে জানিতেন, রমানন্দ স্বামী সিন্ধুপুত্র । তিনি অধিতীর জ্ঞানী বটে । প্রবাদ ছিল যে, তারতবর্ষের সুপ্ৰদর্শন বিজ্ঞানী সকল তিনিই জানিতেন । তিনি বলিতেছিলেন,

“তুন, বৎস চন্দ্রশেখর ! যে সকল বিজ্ঞানপার্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও । আর কদাপি সত্বাপকে হৃদয়ে

জ্ঞান দিও না । কেন না হুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই ।  
সুখ হুঃখত্ব বা বিজ্ঞের কাছে একই । যদি প্রভেদ কর, তবে  
যাহারা পুণ্যাদ্বা বা স্বর্গী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চিরহুঃখী  
বলিতে হয় ।”

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী প্রথমে, যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ  
প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন ।  
শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নলরাজ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন ।  
দেখাইলেন, সার্বভৌম মহাপুণ্যাদ্বা, রাজগণ চিরহুঃখী—কদা-  
চিৎ সুখী । পরে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ  
করিলেন—দেখাইলেন, তাঁহারাও হুঃখী ! দানবপীড়িত, অতি-  
শূল্য ইজাদি দেবতার উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, সুর-  
লোকও হুঃখপূর্ণ । শেষে, মনোমোহিনী বাক্শক্তির দৈবাবতারণা  
করিয়া, অনন্ত, অপরিজ্ঞেয় বিধাতৃহৃদয়মধ্যে অমূল্যজ্ঞান করিতে  
লাগিলেন । দেখাইলেন যে, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি এই হুঃখময়  
অনন্ত সংসারের অনন্ত হুঃখরাশি অনাদি অনন্ত কালাবধি হৃদয়-  
মধ্যে অবশ্য অমূল্য করেন । যিনি দয়াময়, তিনি কি সেই  
হুঃখরাশি অমূল্য করিয়া হুঃকিত হন না ? তবে দয়াময়  
কিসে ? হুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ—হুঃখ না হইলে দয়ার  
সকল কোথায় ? যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত  
হুঃখে অনন্ত কাল হুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন ! যদি  
যে তিনি নির্বিকার, তাহার হুঃখ কি ? উত্তর এই যে, যিনি  
নির্বিকার, তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারে স্ফাহুস্ত—তাঁহাকে স্রষ্টা  
বিধাতা বলিয়া মানি না । যদি কেহ স্রষ্টা বিধাতা থাকেন,  
তবে তাঁহাকে নির্বিকার বলিতে পারি না—তিনি হুঃখময় ।

কিছু তাহাও হইতে পারে না, কেন না তিনি নিত্যানন্দ, অতএব দুঃখ বলিয়া কিছু নাই, ইহাই সিদ্ধ ।”

রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, “আর যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার কর, তবে এই সর্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই ? উপায় নাই ; তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের অস্ত্র নিযুক্ত থাকে, তবে অবশ্য নিবারণ হইতে পারে । দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহ সৃষ্টির দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত ।\* সংসারের সেই দুঃখনিবৃত্তিতে ঐশিক দুঃখেরও নিবারণ হয় । দেবগণ জীবদুঃখ-নিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব সুখ । নচেৎ ইন্দ্রিয়ার্দির বিকারশূন্য দেবতার অস্ত্র সুখ নাই ।” পরে ঋষিগণের লোকহিতৈষিতা কীর্তন করিয়া ভীষ্মাদি বীরগণের পরোপকারিতার বর্ণন করিলেন । দেখাইলেন, যেই পরোপকারী সেই সুখী, অস্ত্র কেহ সুখী নহে । তখন রমানন্দ স্বামী শতমুখে পরোপকার ধর্মের গুণকীর্তন আরম্ভ করিলেন । ধর্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণেতিহাস প্রভৃতি মন্বন করিয়া অনর্গল ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রযুক্ত করিতে লাগিলেন । শকসাগর মন্বন করিয়া শত শত মহার্থ শ্রবণমনোহর, বাক্যপরম্পরা কুসুমমালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন—সাহিত্যভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া, সারবত্তী, রসপূর্ণা, সদলকারিণিষ্টা কবিতানিচয় বিকীরণ করিতে লাগিলেন । সর্বোপরি, আপনার অকৃত্রিম স্বর্নাতুরাজ্যের মৌহময়ী প্রতিভাবিতা ছায়া বিস্তারিতা করিলেন । তাহার সুকণ্ঠ নির্গত, উচ্চারণকোশলযুক্ত সেই অপূর্ব বাক্য, নীল চন্দ্রশেখরের কণ্ঠে তুর্ধানাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল । সে বাক্য সকল কৃষ্ণনগ্ন মেঘগর্জনবৎ গম্ভীর শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল—কখনও

বীণানিকণবৎ মধুর বোধ হইতে লাগিল ! ব্রহ্মচারী বিস্মিত, মোহিত হইয়া উঠিলেন । তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল । তিনি গাত্রোখান করিয়া রমানন্দ স্বামীর পদযেণু গ্রহণ করিলেন । বলিলেন, “গুরুদেব ! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম ।”

রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিলেন ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

### মুকুট পরিচয় ।

এ নিকে যথাসময়, ব্রহ্মচারীদত্ত পত্র নবাবের নিকট পৌঁছাইল । নবাব জানিলেন, সেখানে দলনী আছেন । তাঁহাকে ও কুলসম্মকে লইয়া যাইবার জন্ত প্রতাপ ঝায়েস বাসায় শিবিকা প্রেরিত হইল ।

তখন বেলা হইয়াছে । তখন সে গৃহে শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহই ছিল না । তাঁহাকে দেখিয়া নবাবের অমুচরেরা বেগম বলিয়া স্থির করিল ।

শৈবলিনী তর্জিল, তাঁহাকে কেন্দ্রায় যাইতে হইবে । অকস্মাৎ তাঁহার মনে এক ছুরতিসন্ধি উপস্থিত হইল । কবিগণ আশায় প্রশংসা মুগ্ধ হন । আশা, সংসারের অনেক সুখের কারণ বটে, কিন্তু আশাই দুঃখের মূল । মুক্ত পাপ কৃত হয়, সকলই লাভের আশায় । কেবল, সংকার্য্য কোন আশায় কৃত

হয় না। বাহারা স্বর্গের আশায় সংকার্য্য করুন, তাঁহাদের কার্য্যকে সংকার্য্য বলিতে পারি না। আশায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী, আপত্তি না করিয়া, শিবিকায়োহন করিল।

খোজা, শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া অন্তঃপুরে নবাবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, এ ত দলনী নহে। আরও দেখিলেন, দলনীও একরূপ আশ্চর্য্য সূন্দরী নহে। আরও দেখিলেন যে, একরূপ লোকবিমোহিনী তাঁহার অন্তঃপুরে কেহই নাই।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তুমি কে?”

শৈ। আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ন। তুমি আসিলে কেন?

শৈ। রাজভূতাগণ আমাকে লইয়া আসিল।

ন। তোমাকে বেগম বলিয়া আনিয়াছে। বেগম আসিলেন না কেন?

শৈ। তিনি সেখানে নাই।

ন। তিনি তবে কোথায়?

যখন গল্‌ষ্টন ও জন্সন্ দলনী ও কুলসম্কে প্রতাপের গৃহ হইতে লইয়া যায়, শৈবলিনী তাহা দেখিয়াছিলেন। তাহারা কে তাহা তিনি জানিতেন না। মনে করিয়াছিলেন, চাকরাণী বা নর্ত্তকী। কিন্তু যখন নবাবের ভৃত্য তাঁহাকে বলিল যে, নবাবের বেগম প্রতাপের গৃহে ছিল, এবং তাঁহাকে সেই বেগম মনে করিয়া নবাব লইতে পাঠাইয়াছেন, তখনই শৈবলিনী বুঝিয়াছিলেন যে, বেগমকেই ইংরেজেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী ভাবিতেছিল।

“নবাব শৈবলিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;  
“তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ ?”

শৈ। দেখিয়াছি ।

ন। কোথায় দেখিলে ?

শৈ। যেখানে আমরা কাল রাত্রে ছিলাম।

ন। সে কোথায় ? প্রতাপ রায়ের বাসায় ?

শৈ। আজ্ঞা হাঁ ।

ন। বেগম সেখান হইতে কোথায় গিয়াছেন, জান ?

শৈ। হুই জন ইংরেজ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ।

ন। কি বলিলে ?

শৈবলিনী পূর্ব প্রদত্ত ডোর পুনরুত্তর করিলেন । নবাব  
কেমনী হইয়া রহিলেন । অধর দংশন করিয়া, অশ্রু উৎপাটন  
করিলেন । গুরুগন্থ খাঁকে ডাকিতে আদেশ করিলেন । শৈব-  
লিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন ইংরেজ বেগমকে ধরিয়া  
লইয়া গেল, জান ?

শৈ। না ।

ন। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল ?

শৈ। তাঁহাকেও উহার সেই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ।

ন। তাহার বাসায় আর কোন লোক ছিল ?

শৈ। একজন চাকর ছিল, তাহাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ।

“নবাব, আবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, তাহাদের ধরিয়া  
লইয়া গিয়াছে, জান ?”

শৈবলিনী এতক্ষণ সত্য বলিতেছিল, এখন মিথ্যা আরম্ভ  
করিল । বলিল, “না ।”

ন। প্রভাপ কে? তাহার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী প্রভাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারে চাকরি করিবেন বলিয়া।

ন। তোমার কে ছয়?

শৈ। আমার স্বামী।

ন। তোমার নাম কি?

শৈ। রূপসী।

অনায়াসে শৈবলিনী এই উত্তর দিল। পাণিষ্ঠা এই কথা বলিবার জন্তই আসিয়াছিল।

নবাব বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।”

শৈবলিনী বলিল, “আমার গৃহ কোথা—কোথা যাইবে।

নবাব নিস্তব্ধ হইলেন। পরক্ষণে বলিলেন,

“তবে তুমি কোথায় যাইবে?”

শৈ। আমার স্বামীর কাছে। আমার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দেন। আপনি রাজা, আপনার কাছে নালিশ করিতেছি; —আমার স্বামীকে ইংরেজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; হয়, আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিন, নচেৎ আমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিন। যদি আপনি অবজ্ঞা করিয়া, ইহার উপায় না করেন, তবে এইখানে আপনার সম্মুখে আমি মরিব। সেই জন্ত এখানে আসিয়াছি।

সংবাদ আসিল, গুরুগন্থ খাঁ হাজির। নবাব, শৈবলিনীকে বলিলেন, “অঁচ্চা, তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।”



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

নূতন সখ ।

নবাব গুরগন্ খাঁকে, অন্ত্যস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,

“ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে । আমার বিবেচনায় বিবাদের পূর্বে আমিয়টকে অবরুদ্ধ করা কৰ্ত্তব্য, কেন না আমিয়ট আমার পরম শত্রু । কি বল?”

গুরগন্ খাঁ কহিলেন, “মুখে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত । কিন্তু দুষ্ট অস্পর্শনীয় । দূতের পৌড়ন করিলে, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমাদের নিন্দা হইবে ।—আর—”

নবাব । আমিয়ট কাল রাত্রে এই সহর মধ্যে এক ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে । যে আমার অধিকারে থাকিয়া অপরাধ করে, সে দূত হইলেও আমি কেন তাহার দণ্ডবিধান না করিব ?

গুৰু । যদি সে একরূপ করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ডযোগ্য । কিন্তু তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিব ?

নবাব । এখনই তাহার বাসস্থানে সিপাহী ও কামান পাঠাইয়া দাও । তাহাকে সদলে ধরিয়া লইয়া আনুক ।

গুৰু । তাহার এ সহরে নাই । অতঃ হই প্রহরে চলিয়া গিয়াছে ।

নবাব । সে কি ! বিনা এত্তেলায় ?

গুর। এতেনা দিবার জন্ত হে নামক একজনকে রাখিয়া গিয়াছে।

নবাব। এরূপ হঠাৎ, বিনা অনুমতিতে পলায়নের কারণ কি? ইহাতে আমার সহিত অপোজ্ঞ হইল। তাহা জানিয়াই করিয়াছে।

গুর। তাহাদের প্রতিশ্রুতির নোকার চড়ন্ধার ইংরেজকে কে কাল রাখে খন করিয়াছে। আমিষট্ বলে, আনাদের লোকে খুন করিয়াছে। সেই জন্ত রাগ করিয়া গিয়াছে। বলে, এখানে থাকিলে জীবন অনিশ্চিত।

নবাব। কেন্দ্র করিয়াছে? জানিয়াছ?

গুর। প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তি।

নবাব। আচ্ছা করিয়াছে। তাহার দেখা পাঠিলে দেখলোয়াং দিব। প্রতাপ রায় কোথায়?

গুর। তাহাদিগের সকলকে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়াছে কি আজিনাবাদ পাঠাইয়াছে, ঠিক শুনি নাই।

নবাব। এতক্ষণ আনাকে এ সকল সংবাদ দাও নাই কেন?

গুর। আমি এত নত্ব শুনিলাম।

এ কথাটি মিথ্যা। গুরগন্ গো আদোয়াস্ত সকল আশ্রিতেন, তাহার অনভিমতে আমিষট্ সদাপি মুন্সের ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গুরগন্ গো ছইট উদ্দেশ্য ছিল - প্রথম, দলনৌ মুন্সেরের বাহির হইলেই ভাল; দ্বিতীয়, আমিষট্ একটু চতুর্গত থাকা ভাল, ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা উপকারী হইতে পারিবে।

নবাব গুরগন্ গোকে বিদায় দিলেন। গুরগন্ গো যখন যান,

নবাব, তাহার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । সে দৃষ্টির অর্থ এই, “যতদিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, ততদিন তোমার কিছু বলিব না—যুদ্ধকালে তুমি আমার প্রধান অস্ত্র । তার পর দলনী বেগমের ঋণ তোমার শোণিতে পরিশোধ করিব ।”

নবাব তাহার পর মীর মুন্সিকে ডাকিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরওয়ানা পাঠাও যে, যখন আমিরটের নৌকা মুরশিদাবাদে উপনীত হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করে, এবং তাহার সঙ্গে বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া, ছজুরে প্রেরণ করে । স্পষ্ট যুদ্ধ না করিয়া কলে কোশলে ধরিতে হইবে, ইহাও লিখিয়া দিও । পরওয়ানা তটপথে বাহকের হাতে ষাউক—অগ্রে পহুছিলে ।

নবাব, অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া আবাব শৈবলিনীকে ডাকাইলেন । বাললেন, “একণে তোমার স্বামীকে মুক্ত করা হইল না । ইংরেজেরা তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতার যাত্রা করিয়াছে । মুরশিদাবাদে হকুম পাঠাইলাম, সেখানে তাহাদিগকে ধরিবে । তুমি এখন—”

শৈবলিনী হাত ঘোড় করিয়া কহিল, “বাচাল জীলোককে মার্জনা করুন—এখন লোক পাঠাইলে ধরা যায় না কি ?”

নবাব । ইংরেজদিগকে ধরা অল্প লোকের কৰ্ম্ম নহে । অধিক লোক সশস্ত্রে পাঠাইতে হইলে, বড় নৌকা চাই । ধরিতে ধরিতে তাহারা মুরশিদাবাদ পৌছিতে । বিশেষ যুদ্ধের উত্তোষ দেখিয়া, কি জানি যদি ইংরেজেরা আগে বন্দীদিগকে মারিয়া ফেলে । মুরশিদাবাদে সূচতর কৰ্ম্মচারী সকল আছে, তাহারা কলে কোশলে ধরিবে ।

শৈবলিনী বুঝিল যে, তাঁহার স্বন্দর মুখখানিতে অনেক উপকার হইয়াছে। নবাব তাঁহার স্বন্দর মুখখানি দেখিয়া, তাহার সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিতেছেন। নহিলে এত কথা বুঝাইয়া বলিবেন কেন? শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাত ঘোড় করিল। বলিল,

“যদি এ অনাথাকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা মার্কনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ— তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ। তাঁহার হাতে অস্ত্র থাকিলে তাঁহাকে ইংরেজ কয়েদ করিহুত পারিত না—তিনি যদি এখন হাতিয়ার পান, তবে তাঁহাকে কেহ কয়েদ রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ তাঁহাকে অস্ত্র দিয়া আসিতে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হইতে পারিবেন, সঙ্গীদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন।”

নবাব হাসিলেন, বলিলেন, “তুমি বালিকা, ইংরেজ কি তাহা জান না। কে তাঁহাকে সে ইংরেজের নোকার উঠিয়া অস্ত্র দিয়া আসিবে?”

শৈবলিনী মুখ নত করিয়া, অক্ষুটস্বর বলিলেন, “যদি হুকুম হয়, যদি নোকা পাই, তবে আমিই যাইব।”

নবাব উচ্চ হাস্য করিলেন। ছাতি গুলিয়া শৈবলিনী ক্রুদ্ধিত করিল, বলিল, “প্রভু! না পারি আমি মরিব—তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি পারি, তবে আমারও কার্য-সিদ্ধি হইবে, আপনারও কার্যসিদ্ধি হইবে।”

নবাব শৈবলিনীর কৃষ্ণিত ক্রোধোত্তিত মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, এ সামান্য স্ত্রীলোক নহে। ভাবিলেন, “মরে মরুক,

আমার ক্ষতি কি ? যদি পারে ভালই—নহিলে মুরশিদাবাদে মতামত তকি কার্যাসিদ্ধি করিবে।” শৈবলিনীকে বলিলেন, “তুমি কি একাই যাউবে ?”

শৈ। দ্বীলোক, একা যাইতে পারিব না । যদি দয়া করেন, তবে সঙ্গে একজন দাসী, একজন রক্ষক, আজ্ঞা করিয়া দিন ।

নবাব চিন্তা করিয়া মসীবুদ্দিন নামে একজন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ, এবং সাহসী খোজাঝে ডাকাইলেন । সে আসিয়া প্রণত হইল । নবাব তাকে বলিলেন, “..

“এই দ্বীলোককে সঙ্গে লও । এবং একজন হিন্দু বাদী সঙ্গে লও । ইনি যে হাতিয়ার লইতে বলেন, তাহাও লও । নৌকার দারোগার নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ লও । এই সকল লইয়া, এইক্ষণেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর ।”

মসীবুদ্দিন ১৬জ্ঞাসা করিল, “কোন ব্যাখা উদ্ধার করিতে হইবে ?”

নবাব । ইনি বাহা বলিবেন, তাহাই করিবে । বেগমদিগের মত ইহাকে মাজ করিবে । যদি দলনী বেগমেব সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে ।

পহল উন্ময়ে নবাবকে যথাবীতি অভিবাদন করিয়া, বিদায় হইল । খোজা যেরূপ করিল, শৈবলিনী দেখিয়া, দেখিয়া, সেইরূপ নাড়ি ছুঁইয়া পিছু হঠিয়া সেলাম করিল । নবাব হাসিলেন ।

নবাব গমনকালে বলিলেন, “বিবি, স্মরণ রাখিও । কখনও যদি মুন্সিলে পড়, তবে মীরকাসেমের কাছে আসিও ।”

শৈবলিনী পুনরবার সেলাম করিল । মনে মনে বলিল,

“আসিব বৈ কি ? হয়, তং রূপসীর সঙ্গে স্বামী লটুয়া দরবার করিবার জন্ত তোমার কাছে আসিব ।”

মসীবুদ্দীন পরিচারিকা ও নোকা সংগ্রহ করিল। এবং শৈবলিনীর কথামত বন্দুক, গুলি, বাকরদ, পিস্তল, তরবারি ও ছুরি সংগ্রহ করিল। মসীবুদ্দীন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, এ সকল কি হইকে। মনে মনে করিল যে, এ দোসরা গাদ সুলতান।

সেই রাত্রেই তাহারা নোকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাঁদে ।

গোয়ায় নুটিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে অসংখ্য বিস্তৃত বালুকা-নয় চর। চন্দ্রকরে, সিকতা-শ্রী অধিকতর ধবলম্বী ধরিয়াকে ; গঙ্গার জল, চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটাক্রান্ত বনরাজী বনশ্রাম, উপরে আকাশ রত্ন-খচিত নীল। একরূপ সময়ে বিস্তৃতি জানে কখনও কখনও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত ; যতদূর দেখিতেছি নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবদৃষ্টির ছায় অস্পষ্ট দৃষ্টে ভবিষ্যতে মিশাই-রাছে। নীচে নদী অনন্ত ; পার্শ্বে বালুকান্নি অনন্ত ; ত

বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত ; উপরে আকাশ অনন্ত ; তন্মধ্যে তারকা-মালা অনন্তসংখ্যক । এমন সময়ে কোন্ মহুশ্য আপনাকে গণনা করে ? এই যে নদীর উপকূলে যে বাসুকাত্মে তরলীর শ্রেণী বাধা রহিয়াছে, তাহার বাসুকাকণার অপেক্ষা মহুশ্যের গোরব কি ?

এই তরলীশ্রেণীর মধ্যে একখানি বড় বজ্রা আছে—তাহার উপরে সিপাহীর পাহারা । সিপাহীদ্বয়, গঠিত মূর্তির ভায়, বন্দুক দ্বন্ধে করিয়া স্থির দাড়াইয়া রহিয়াছে । ভিতরে, মিত্র ক্ষাটিক-দীপের আলোকে নানাবিধ মহার্ঘ আসন, শয্যা, চত্র, পদ্ম প্রভৃতি শোভা পাইতেছে । ভিতরে কবজ-সাহেব । দুইজনে সতরঞ্চ খেলিতেছেন । একজন সুরাপান করিতেছেন । ও পড়িতে-ছেন । একজন বাগবাদন করিতেছেন ।

অকস্মাৎ সকলে চমকিয়া উঠিলেন । সেই নৈশ নীরবতা বিনোদ করিয়া, সহসা বিকট ক্রন্দনধ্বনি উথিত হইল ।

আমিরট্ সাহেব জন্সনকে কিস্তি দিতে দিতে বলিলেন, “ও কি ও ?”

জন্সন বলিলেন, “কার কিস্তিমাত হইয়াছে ।”

ক্রন্দন বিকটতর হইল । ধ্বনি বিকট নহে ; কিন্তু সেই জলভূমির নীরব প্রান্তরমধ্যে এই নিশীথ ক্রন্দন বিকট শুনাইতে লাগিল ।

আমিরট্ গেল ফেলিয়া উঠিলেন । বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ দেখিলেন । কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না । দেখিলেন, নিকটে কোথাও আলোক নাই । ঠেসকতভূমির মধ্যভাগ হইতে শব্দ আসিতেছে ।

আমিয়ট্ নোকা হইতে অবতরণ করিলেন। ঋষির অহং-  
সরণ করিয়া চলিলেন। কিয়ৎকাল গমন করিয়া দেখিলেন, সেই  
বালুকাপ্রান্তরমধ্যে একাকী কেহ বসিয়া আছে।

আমিয়ট্ নিকটে গেলেন। দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক  
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

আমিয়ট্ হিন্দী ভাষা জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা  
করিলেন, “কে তুমি? কেন কাঁদিতেছ?” স্ত্রীলোকটি তাহার  
হিন্দী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে  
লাগিল।

আমিয়ট্ পুনঃপুনঃ তাহার কথার কোন উত্তর না পাইয়া  
হতভিত্তের দ্বারা তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। রমণী  
উঠিল। আমিয়ট্ অগ্রসর হইলেন। রমণী তাহার সঙ্গে সঙ্গে  
কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—পাপিষ্ঠা  
শৈবলিনী।



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

হাসে ।

বজ্রার ভিতরে আসিয়া আমিষট্ গল্‌ষ্টনকে বলিলেন, “এই জীলোক একাকিনী চরে বসিয়া কাঁদিতেছিল । ও আমার কথা বুঝে না, আমি উহার কথা বুঝি না । তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর ।”

গল্‌ষ্টন, প্রায় আমিষট্‌র মত পণ্ডিত ; কিন্তু ইংরেজ মহলে হিন্দিতে তাঁহার বড় পসার । গল্‌ষ্টন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কে তুমি ?”

শৈবলিনী কথা কহিল না, কাঁদিতে লাগিল ।

গ । কেন কাঁদিতেছ ?

শৈবলিনী তথাপি কথা কহিল না—কাঁদিতে লাগিল ।

গ । তোমার বাড়ী কোথায় ?

শৈবলিনী পূর্ববৎ ।

গ । তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?

শৈবলিনী উরুপ ।

গল্‌ষ্টন হারি মানিল । কোন কথার উত্তর দিল না, দেখিয়া ইংরেজেরা শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন । শৈবলিনী সে কথাও বুঝিল না—নড়িল না—দাঁড়াইয়া রহিল ।

• আমিয়ট্ বলিলেন, “এ আমাদিগের কথা বুঝে না—আমরা উহার কথা বুঝি না। পোষাক দেখিয়া বোধ হইতেছে, ও বাঙ্গালীর মেয়ে। একজন বাঙ্গালীকে ডাকিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বল।”

সাহেবের খানসামারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী মুসলমান। আমিয়ট্ তাহাদিগের একজনকে ডাকিয়া কথা কহিতে বলিলেন।

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল, “কহিতেছ কেন?”

শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিল। খানসামা সাহেবদিগকে বলিল, “পাগল।”

সাহেবেরা বলিলেন, “উহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি চায়?”

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল। • শৈবলিনী বলিল, “কি দে পেয়েচে।”

খানসামা সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিল। আমিয়ট্ বলিলেন, “উহাকে কিছু পাইতে দাও।”

খানসামা অতি দ্রুতচিন্তে শৈবলিনীকে বাবচিখানার নোকায় লইয়া গেল। দ্রুতচিন্তে, কেননা শৈবলিনী পরমা সুন্দরী। শৈবলিনী কিছুই খাইল না। খানসামা বলিল, “খাও না।” শৈবলিনী বলিল, “ব্রাহ্মণের মেয়ে : তোমাদের ছোঁওয়া খাব কেন?”

খানসামা গিয়া সাহেবদিগকে এ কথা বলিল। আমিয়ট্ সাহেব বলিলেন, “কোন নোকায় কোন ব্রাহ্মণ নাই?”

খানসামা বলিল, “একজন সিপাহী ব্রাহ্মণ আছে। আর কয়েকজন ব্রাহ্মণ আছে।”

সাহেব বলিলেন, “যদি কাহারও ভাত খাও দিতে বল।”

খান্সামা শৈবলিনীকে লইয়া প্রথমে সিপাহীদের কাছে গেল। সিপাহীদের নিকট কিছুই ছিল না। তখন খান্সামা, যে নৌকার সেই ব্রাহ্মণ করেদী ছিল, শৈবলিনীকে সেই নৌকার লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ করেদী, প্রতাপ রায়। একখানি ক্ষুদ্র পান্সীতে, একা প্রতাপ। বাহিরে, আগে পিছে সাজীর পাহারা। নৌকার মধ্যে অন্ধকার।

খান্সামা বলিল, “ওগো ঠাকুর !” প্রতাপ বলিল, “কেন ?”

খা। ভোগার হাঁড়িতে ভাত আছে ?

প্র। কেন ?

খা। এমনি ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে। দুটি দিতে পার ?

প্রতাপেরও ভাত ছিল না। কিন্তু প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না।

বলিলেন, “পারি। আমার হাতের হাড়কড়ি খুলিয়া দিতে বল।”

খান্সামা সাজীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল। সাজী বলিল, “হকুম দেওয়াও।”

খান্সামা হকুম করাইতে গেল। পরের জন্ত এত জল বেড়া-বেড়ি কৈ কল্প ? বিশেষ পীরবক্স সাহেবের খান্সামা ; কখনও ইচ্ছাপূর্বক পরের উপকার করে না। পৃথিবীতে বত প্রকার মহত্ব আছে, ইংরেজদিগের মুসলমান খান্সামা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু এখানে পীরবক্সের একটু দার্দ ছিল। সে মনে করিয়াছিল, এ জীলেকিটার খাওয়া দাওয়া হইলে ইহাকে একবার

খান্সামা-মহলে লইয়া গিয়া বসাইব। পীরবক্স শৈবলিনীকে আহ্বান করাইয়া বাধ্য করিবার জন্য যান্ত্র হইল। প্রতাপের নোকায় শৈবলিনী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল—খান্সামা হুকুম করাইতে আমিয়ট সাহেবের নিকট গেল। শৈবলিনী অব-  
শুণ্ণনাবৃত্তা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী জ্ঞী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র। আমিয়ট দেখিয়াছিলেন যে, এই “জেন্টু” জ্ঞীলোকটি নিকপমা রূপবতী—তাহাতে আবার পাগল শুনিয়া একটু দয়াও হইয়াছিল। আমিয়ট জমাদ্দার দ্বারা প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার এবং শৈবলিনীকে প্রতাপের নোকায় ভিতর প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি পাঠাইলেন।

খান্সামা আলো আনিয়া দিল। সাত্তী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খান্সামাকে সেই নোকায় উপর আসিতে নিবেদন করিয়া প্রতাপ আলো লইয়া মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। অভিপ্রায় পলায়ন।

শৈবলিনী নোকায় ভিতরে প্রবেশ করিল। সাত্তীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল—নোকায় ভিতর দেখিতে পাইতেছিল না। শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া, প্রতাপের সম্মুখে গিয়া অবশুণ্ণন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপের বিশ্বয় অপনীত হইলে, দেখিলেন, শৈবলিনী অধর দংশন করিতেছে, মুখ ভীষণ হর্ষপ্রকৃত,—মুখমণ্ডল হির-প্রতিজ্ঞার চিহ্নযুক্ত। প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে।

শৈবলিনী অতি লঘুস্বরে, কানে কানে বলিল, “হাত ধোও—  
আমি কি ভাতের কান্না ?”

প্রতাপ হাত ধুইল। সেই সময়ে শৈবলিনী কানে কানে  
বলিল,

“এখন পলাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার  
জাহাজ।”

প্রতাপ সেইরূপ স্নরে বলিল, “আগে তুমি যাও। নচেৎ  
তুমি বিপদে পড়িবে।”

শৈ। এই বেলা পলাও। হাতকড়ি দিলে আব পলাইতে  
পারিবে না। এই বেলা, জাল কাঁপ দাও। বিলম্ব করিও  
না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চল। আমি পাগল ভলে  
কাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জাহাজ জলে কাঁপ  
দাও।

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চৈর্হাস্ত করিয়া উঠিল। হাসিতে  
হাসিতে বলিল, “আমি ভাত খাইব না।” তখনই আবার  
ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিল, “আমাকে মুসল-  
মানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমির জাত গেল—মা গঙ্গা  
ধরিও।” এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে কাঁপ দিয়া  
পড়িল।

“কি হইল? কি হইল?” বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে  
করিতে নৌকা হইতে বাহির হইল। সাত্তী সম্মুখে দাঁড়াইয়া  
নিষেধ করিতে খাইতেছিল। “হারাম্‌জাদা! জ্বীলোক ডুবিয়া  
মরে, তুমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছ?” এই বলিয়া প্রতাপ সিপা-  
হীকে এক পদাঘাত করিলেন। সেই এক পদাঘাতে সিপাহী

পান্ধী হইতে পড়িয়া গেল। তীরের দিকে সিপাহী পড়িল।  
“জীলোককে রক্ষা কর” বলিয়া প্রতাপ অপর দিকে জলে  
ঝাঁপ দিলেন। সম্ভরণপটু শৈবলিনী আগে আগে সাঁতার দিয়া  
চলিল। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সম্ভরণ করিয়া চলিলেন।

“কয়েদী ভাগিল”, বলিয়া পশ্চাতের সাত্তী ডাকিল। এবং  
প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার  
দিতেছেন।

প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, “ভয় নাই—পলাই নাই। এই  
জীলোকটাকে উঠাইব—সম্মুখে জীহত্যা কি প্রকারে দেখিব?  
তুই বাপু হিন্দু—বুঝিয়া ব্রহ্মহত্য্য করিসু।”

সিপাহী বন্দুক নত করিল।

এই সময়ে শৈবলিনী সর্বশেখের নোকার নিকট দিয়া  
সম্ভরণ করিয়া যাইতেছিল। সেখানি দেখিয়া শৈবলিনী অক-  
স্মাৎ চমকিয়া উঠিল। দেখিল যে, যে নোকার শৈবলিনী  
লরেন্স ফষ্টের সঙ্গে বাস করিয়াছিল, এ সেই নোকা।

শৈবলিনী কম্পিতা হইয়া ক্ষণকাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল।  
দেখিল, তাহার ছাদে, জ্যোৎস্নার আলোকে, ক্ষুদ্র পালঙ্কের  
উপর একটি সাহেব অঙ্গশয়নাবস্থায় রহিয়াছে। উদ্ভল চন্দ্র-  
রাশি তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। শৈবলিনী চাঁৎকার শব্দ  
করিল—দেখিল পালঙ্কে, লরেন্স ফষ্টর!

লরেন্স ফষ্টরও সম্ভরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে  
চিনিলা—শৈবলিনী। লরেন্স ফষ্টরও চাঁৎকার করিয়া বলিল,  
“পাক্‌ড়ো! পাক্‌ড়ো! হামারা বিবি!” ফষ্টর লীর্ণ, ক্রম, হর্ষল,  
শয্যাগত, উত্থানশক্তিরহিত।

ফষ্টরের শব্দ শুনিয়া চারি পাঁচজন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্ত জলে বাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে। তাহার প্রতাপে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, “পাক্‌ড়ো! পাক্‌ড়ো! ফষ্টর সাহাব ইনাম্ দেগা।” প্রতাপ মনে মনে বলিল, “ফষ্টর সাহেবকে আমিও একবার ইনাম্ দিয়াছি—ইচ্ছা আছে আর একবার দিব।” প্রকাশে ডাকিয়া বলিল, “আমি ধরিতেছি—তোমরা উঠ।”

এই কথার বিশ্বাস করিয়া সকলে তিরিল। ফষ্টর বুঝে নাই যে, অগ্রবর্তী ব্যক্তি প্রতাপ। ফষ্টরের মস্তিষ্ক তখনও নীরোগ হয় নাই।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

### ভগাধ জন্মে সাঁতার ।

ছুই জনে সাঁতারিয়া, অনেকদূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি স্নেহের সাগরে সাঁতার! এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশাল-হৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচমালিনী, নীলমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকর-সাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই উজ্জ্বল অনন্ত নীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল! তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মনুষ্য ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সস্তরগকারী

জীব হইতে পারি ? সাঁতার ? কি ছার কুজ পার্থিব নদীতে সাঁতার ? জন্মিয়া অবধি এই দুঃস্থ কাল-সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি—ভগবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি ? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের ত তল আছে,—আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি ।

তুমি গ্রাহ্য কর, না কর, তাই বলিয়া ত জড়-প্রকৃতি চাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রয় না । তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দাও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না—কুজ বীচির মালা ছিঁড়ে না—তারা তেমনিই জলে—তীরে বৃক্ষ তেমনিই দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনিই খেলে । জড়-প্রকৃতির দোরাওয়া ! মেহময়ী সাঁতার ছায়া, সকল সময়েই আদর করিতে চায় ।

এ সকল কেবল প্রতাপের চক্ষু । শৈবলিনীর চক্ষু নহে । শৈবলিনী নোকল উপর যে রুগ্ন, শীর্ণ, শ্বেতবুধমণ্ডল দেখিয়া-ছিল, তাহার মনে কেবল তাহাই জাগিতেছিল । শৈবলিনী কলের পুতলীর ছায়া সাঁতার দিতেছিল । কিন্তু শাস্তি নাই । উভয়ে সস্তরগপটু । সস্তরগে প্রতাপের আনন্দ-সাগর উইলিয়া উঠিতেছিল ।

প্রতাপ ডাকিল,

“শৈবলিনী—শৈ”

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল । বালা-কালে প্রতাপ তাহাকে “শৈ” বা “সই” বলিয়া ডাকিত । আবার সেই প্রিয় সন্মোদন করিল । কত কাল পরে ! বৎসরে কি কালের মাপ ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ । শৈবলিনী



যত বৎসর, সেই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মনস্তত্ত্ব।  
এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশির মাধ্য চক্ষু মুদিল।  
মনে মনে চন্দ্র তারাকে সাক্ষী করিল : চক্ষু মুদিয়া বলিল,

“প্রতাপ ! আজিও এ মরা গঙ্গার চাঁদের আলো কেন ?”

প্রতাপ বলিল, “চাঁদের ? না। সূর্য্য উঠিয়াছে।—শৈ ! আর  
ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।”

শৈ। তবে চল তীরে উঠি।

প্র। শৈ !

শৈ। কি ?

প্র। মনে পড়ে ?

শৈ। কি ?

প্র। আর একদিন এমগই সীতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী উত্তর দিল না। এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া  
যাইতেছিল ; শৈবলিনী তাহা ধরিল। প্রতাপকে বলিল, “ধর,  
ভয় সহিবে। বিশ্রাম কর।” প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিল। বলিল,

“মনে পড়ে ? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম ?”

শৈবলিনী বলিল, “মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই  
নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম।  
কেন ডাকিলে ?”

প্র। তিন মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি ?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল, “কেন প্রতাপ ? চল তীরে  
উঠি।”

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব।

প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন, প্রতাপ ?

প্র। তামালা নয়—নিশ্চিত ডুবির—তোমার হাত ।

শৈ। কি চাও, প্রতাপ ? যা বল চাই করিব ।

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব ।

শৈ। কি শপথ প্রতাপ ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল । তাহার চক্ষে, তারা সব নিবিয়া গেল । চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল । নীলজল নীল-অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল । ফটর আসিয়া যেন সন্মুখে তরণারি হস্তে দাঁড়াইল । শৈবলিনী রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, “কি শপথ, প্রতাপ ?”

উভয়ে পাশাপাশি কাষ্ঠ ছাড়িয়া সাঁতার দিতেছিল । সন্ধ্যা কলকল চলচল জলভঙ্গরব-মধ্যে এই ভয়ঙ্কর কণা হইতেছিল ! চারি পাশে প্রক্ষিপ্ত বারিকণা-মধ্যে চন্দ্র হাসিতেছিল । জড়-প্রকৃতির দৌরাশ্ব্য !

“কি শপথ প্রতাপ ?”

প্র। এই গজার জলে—

শৈ। আমার গজা কি

প্র। তবে ধর্ম সাক্ষী করিয়া বল—

শৈ। আমার ধর্মই বা কোথায় ?

প্র। তবে আমার শপথ ?

শৈ। কাছে আইস—হাত দাও ।

প্রতাপ নিকটে গিয়া, বহুকাল পরে শৈবলিনীর হাত ধরিল । হুই জনের সাঁতার দেওয়া ভার হইল । আবার উভয়ে কাষ্ঠ রিল ।

শৈবলিনী বলিল, “এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি—কতকাল পরে প্রত্যাপ ?”

প্র। আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্ত প্রাণ ? কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সঙ্গিতে চায় ? চাঁদের আলোর এষ্ট স্থির গঙ্গার মাঝে যদি, এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি ?

উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

শৈবলিনী বলিল—“তোমার শপথ—কি বলিবে ?”

প্র। শপথ কর,—আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ বাচন শুভাশুভের তুমি দাতা—

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।

প্রত্যাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রক্ষ, তাহার পালন অসাধ্য, প্রাণান্তকর ; শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল—

“এ সংসারে আমার মত দুঃখী এক আছে, প্রত্যাপ ?”

প্র। আমি !

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য আছে—বল আছে—কীর্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রত্যাপ ?

প্র। কিছুই না—আইস তবে দুই জনে ডুবি।

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। নিস্তার ফলে, তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। “আমি মরি

তাহাতে ক্ষতি কি ? কিন্তু আমার জন্ত প্রতাপ মরিবে কেন ?  
প্রকাশ্যে বলিল, তীরে চল ।”

প্রতাপ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ডুবিল ।

তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল । শৈবলিনী  
টানিল । প্রতাপ উঠিল ।

শৈ। আমি শপথ করিব । কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া  
দেখ । আমার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ । আমি তোমাকে চাহি  
না । তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব ? ..

প্রতাপ হাত ছাড়িল । শৈবলিনী আবার ধরিল । তখন  
অতি গভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাস্পরিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা  
কহিতে লাগিল—বলিল—

“প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর । প্রতাপ, তুমি তোমার ‘শপথ’  
করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাচন শুভাশুভ আমার  
দায় । তুমি, তোমার শপথ ! আজি হইতে তোমাকে ভুলিব ।  
আজি হইতে আমার সর্বস্বকে জলাঞ্জলি ! আজি হইতে আমি  
মনকে দমন করিব । আজি হইতে শৈবলিনী মরিল ।”

শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিল । কাঠ ছাড়িয়া দিল ।

প্রতাপ গঙ্গাদ-কণ্ঠে বলিল, “চল, তীরে উঠি ।”

উভয়ে গিয়া তীরে উঠিল ।

পদব্রজে গিয়া বাক ফিরিল । ছিপ নিকটে ছিল । উভয়ে  
তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিল । উভয়ের মধ্যে কেহই জানিত  
না যে, রমানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বিশেষ অধিনিবেশের সহিত  
লক্ষ্য করিতেছেন ।

এ দিকে ইংরেজের লোক তখন মনে করিল, কয়েদী

পলাইল। তাহারা পশ্চাৎহী হইল। কিন্তু ছিপ নীচ অদৃশ্য হইল।

রূপসীর সঙ্গে মোকদ্দমায় আরম্ভি শেষ না হইতেই শৈব-লিনীর হার হইল।

সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদ।

রামচরণের মুক্তি।

প্রতাপ যদি পলাইল, তবে রামচরণের মুক্তি সহজেই ঘটিল। রামচরণ ইংরেজের নৌকায় বন্দিভাবে ছিল না। তাহারই গুলিতে যে, কয়েকের আঘাত ও সাত্তীর নিপাত ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না। তাহাকে সামান্য ভূতা বিবেচনা করিয়া, আমিয়ট মজের হটতে যাত্রাকালে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, “তোমার মনিব বড় বদজাত, উহাকে আমরা সাজা দিব, কিন্তু তোমাতে আমাদের কোন গুয়োজন নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।” শুনিয়া রামচরণ সেলাম করিয়া যুক্তকরে বলিল, “আমি চাষা গোয়াল—কথা জানি না—রাগ করিবেন না—আমার সঙ্গে আপনাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?”

আমিয়টকে কেহ কথা বুঝাইয়া দিলে, আমিয়ট জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?”

রা। নহিলে আমার সঙ্গে তামাসা করিবেন কেন?

আমিয়ট। কি তামাসা?

রা। আমার পা জাব্বিরা দিরা, বেখানে ইচ্ছা সেখানে  
বাইতে বলার বুঝ'র যে আমি আপনাদের বাড়ী বিবাহ করি-  
রাছি। আমি গোয়ালার ছেলে, ইংরেজের ভগিনী বিবাহ করিলে  
আমার জাত যাবে।

দ্বিভাবী আমিয়টকে কথা বুঝাইয়া দিলেও তিনি কিছু বুঝিতে  
পারিলেন না। মনে ভাবিলেন, এ বুঝি এক প্রকার এদেশী  
খোষামোদ। মনে করিলেন, যেমন নোটবেরা খোষামোদ করিয়া  
“মা বাপ” “ভাই” এইরূপ সম্বন্ধসূচক শব্দ ব্যবহার করে, রাম-  
চরণ সেইরূপ খোষামোদ করিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধী বলিতেছে।  
আমিয়ট নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,  
“তুমি চাও কি?”

রামচরণ বলিল, “আমার পা জোড়া দিরা দিতে” হকুন  
হউক।”

আমিয়ট হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা তুমি কিছু দিন আমা-  
দিগের সঙ্গে থাক. ঐষধ দি

রামচরণ তাহাই চায়। প্রস্তাপ বন্ধী হইয়া চলিলেন, রাম-  
চরণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়। সুতরাং রামচরণ ইচ্ছাপূর্বক  
আমিয়টের সঙ্গে চলিল। সে কয়েক রটিল না।

যে রাত্রে প্রস্তাপ পলায়ন করিল সেই রাত্রে রামচরণ  
কাহাকে কিছু না বলিয়া নোকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া  
গেল। গমনকালে, রামচরণ অক্ষুট-স্বরে ইণ্ডিয়ামিডিলের  
পিতৃমাতৃভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে বলিতে  
গেল। পা জোড়া লীগিরাছিল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### পৰ্বতোপরি।

আজি রাত্রিতে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চক্রে, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিদ্রশূন্য, অনন্তবিস্তারী, জলপূর্ণতার অস্ত্র ধূমবর্ণ;—তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার; গাঢ়, অনন্ত, সর্বাবরণকারী অন্ধকার; তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ বসিগির্জা সকল ঢাকিয়াছে। সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকা একাকিনী।

শেষ রাত্রে, ছিপ পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজদিগের অনুচরদিগকে দূরে রাগিয়া, তীরে লাগিয়াছিল—বড় বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটি নিভৃত স্থানে ছিপ লাগাইয়াছিল। সেই সময়ে, শৈবলিনী, অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিল। এবার শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে দহমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণত্যাগী, শৈবলিনী, সুখ সৌন্দর্য্য-প্রণয়াদি-পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাজ্ঞাও পরিহার্য্য—নিকটে থাকিলে কে আকাজ্ঞা পরিহার করিতে পারিত? কতদূরে থাকিলে কোন্‌ ভূমিত পথিক, স্থলীতল বন্ধ আমিরট। কি ও পান না করিয়া থাকিতে পারে? বিষ্টের

হাংগো যে-সমুদ্রতলবাসী, রাক্ষসস্বভাব ভয়ঙ্কর পুরুষজের বর্ণনা করিয়াছেন, লোভ বা আকাঙ্ক্ষাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা অতি বৃহৎ ফাটকিনির্মিত জলমধ্যে বাস করে, ইহার বাসগৃহতলে মৃদল জ্যোতিঃপ্রকৃত চারু গৈরিকাদি ঈষৎ জলিতে থাকে; ইহার গৃহে কত মহামূল্য মুক্তা-প্রবালাদি কিরণ প্রচার করে; কিন্তু ইহা মনুষ্যের শোণিত পান করে; যে ইহার গৃহসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তপার-গমন করে, এই শতবাহু রাক্ষস, ক্রমে এক একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরে; ধরিলে আর কেহ ছাড়াইতে পারে না। শত হস্তে সহস্র গ্রন্থিতে জড়াইয়া ধরে; তখন রাক্ষস, শোণিতশোষণ সহস্র মুখ হস্তভাগ্য মনুষ্যের অঙ্গে স্থাপন করিয়া তাহার শোণিত-শোষণ করিতে থাকে।

শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রূপে জল দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়নবৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই, তাহার সন্ধান করিলে। এ জন্ত নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া বতদূর পারিল, ততদূর চলিল। ভারতবর্ষের কটিবন্ধ স্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইল। গিরি আরোহণ করিলে, পাছে, অহুসন্ধান-প্রবৃত্ত কেহ তাহাকে পায়, এজন্ত দিবাভাগে গিরি আরোহণে প্রবৃত্ত হইল না। বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল। সমস্ত দিন অনাহারে গেল। সারাক্ষকাল অতীত হইল, প্রথম অন্ধকার, পরে জ্যোৎস্না উঠিলে। শৈবলিনী অন্ধকারে, গিরি আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে শিলাখণ্ড সরলের আঘাত-পদব্রত কত বিকৃত হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র লতা গুল্ম মধ্যে পথ পাওয়া যায় না;



‘তার কণ্টকে ভগ্ন শাখাগ্রভাগে, বা মলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদি সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রাণচিহ্ন আরম্ভ হইল।’

তাছাড়া শৈবলিনীর দুঃখ হইল না। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রাণচিহ্নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী স্তম্ভময় সঁসার ত্যাগ করিয়া, এ কীৰণ কণ্টকময়, হিংস্রকঙ্কপরিবৃত্ত পৰ্ব্বত্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ততকাল ঘোবতর পাপে নিমগ্ন হইয়াছিল—এখন দুঃখভোগ করিলে কি সে পাপের কোন উপশম হইবে।

অতএব ক্ষতবিক্ষতচরণে, ‘শোণিতাক্ত কলেবরে, ক্ষুধার্ত পিপাসাপীড়িত হইয়া শৈবলিনী গিরি আরোহণ কবিতো লাগিল। পথ নাই—লতা, গুল্ম এবং শিলারাশির মধ্যে দিনেও পথ পাওয়া যায় না—এক্ষণে অন্ধকার। অতএব শৈবলিনী বহু কষ্টে অরুদ্র মাত্র আরোহণ করিল।

এমন সময়ে ঘোরতর মেঘাভ্রমর করিয়া আসিল। রক্তশূন্য, ছেনশূন্য, অনন্তবিস্তৃত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ জাঁটিয়া দিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া, গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী, সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্মক—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রস্তর, কণ্টক, এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর পৰ্ব্বতারোহণ চেষ্টা বৃথা—শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টকবনে উপবেশন করিল।

আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর! মকে

সঙ্গে অতি গভীর মেঘগর্জন আরম্ভ হইল। শৈবলিনী বুঝিল, বিষম নৈদাঘ বাত্যা সেই, অদ্রিসামুদ্রেশে প্রধাবিত হইবে। ক্ষতি কি? এই পর্বতাক্র হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে স্মৃথ ঘটিবে না?

অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। একবিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা! তাঁর পর নিগন্তব্যাপী গর্জন। সে গর্জন, বৃষ্টি, বায়ুর এবং মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলব্ধের অবতরণ শব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত, তরঙ্গমালায় কোলাহল। অবনত মস্তকে পর্বতীয় প্রস্তরাসনে, শৈবলিনী বসিয়া—মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে। অঙ্গের উপর বৃক্ষলতা জলদিগ্ন শাখা সকল বায়ুতড়িত হইয়া প্রহত হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার প্রহত হইতেছে। শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষম বেগে আসিয়া শৈবলিনীর উরুদেশ পর্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে।

তুমি জড়-প্রকৃতি! তোমার কোটি কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, মেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অলচ তোমি হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্বসুখের আকর, সর্বমঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা, সর্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্বদয়ক্ষমকরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাত্মবৃদ্ধি নানারূপরসিনি! ঝালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার স্রোতস্বিতে পুষ্পমালা

গাথিয়া গুল্পে গুল্পে চন্দ্র বুলাইগাহ; সৈকত বালুকার কত কোটি কোটি হীরক আলিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাহাতে কত স্থখে যুবক যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি ? তুমি অবিশ্বাসযোগ্য! সৰ্কনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সৰ্কময়ী, সৰ্ককর্তা, সৰ্কনাশিনী এবং সৰ্কশক্তি ময়ী। তুমি ঐশী মায়া, “তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অস্ত্রের। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।

অনেক পার নৃষ্টি থামিল; বড় থামিল না—কেবল মনোভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাটতর হইল। শৈবলিনী বুঝিল, যে জলনিক্ত পিচ্ছিল পর্কতে আরোহণ অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেই খানে বসিয়া শীতে কাপিতে লাগিল। তখন তাহার গার্হস্থ-সুখপূর্ণ বেগুনামে পতিগৃহ স্রবণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও স্থখে মরিব। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—বুঝি আর সূর্য্যোদয়ও দেখিতে পাইব না। পুনঃপুনঃ যে স্বত্বকে ডাকিয়াছি, অস্ত্র সে নিকট। এমন সময়ে সেই মনুষ্যশৃঙ্গ পর্কতে, সেই অগম্য বনমধ্যে, সেই মহাবীর অন্ধকারে, কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গারে ভাত দিল।

শৈবলিনী ঐখানে মনে করিল কোন বস্ত্র পণ্ড। শৈবলিনী সরিয়া বসিল। কিন্তু আবার সেই হস্তস্পর্শ—স্পষ্ট মনুষ্যহস্তের স্পর্শ—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শৈবলিনী ভয়বিকৃত কণ্ঠে বলিল, “তুমি কে ? দেবতা না মনুষ্য ?” মনুষ্য হইতে

শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে, কেন না দেবতা দণ্ডবিধাতা।

কেহ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শৈবলিনী বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে দুই হাত দিয়া ধরিতেছে। শৈবলিনী উক নিঃস্বাস্পর্শ স্বরূপে অমুভূত করিল। দেখিল, এক ভূজ শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইল—আর এক হস্তে শৈবলিনীর দুই পদ একত্র করিয়া বেড়িয়া ধরিল। শৈবলিনী দেখিল, তাহাকে উঠাইতেছে। শৈবলিনী একটু চীৎকার করিল—বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে ভ্রমোপরি উত্থিত করিয়া ক্রোধের লইয়া যায়। কিয়ৎকাল পরে অমুভূত হইল যে, সে শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্বতারোহণ করিতেছে। শৈবলিনী ভাবিল যে, এ যেই হউক, লয়েল্ কষ্ট নহে।





ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ ।







---

চতুর্থ খণ্ড ।

---

প্রারম্ভিক ।

---

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

প্রতাপ কি করিলেন ।

প্রতাপ জমীদার, এবং প্রতাপ দস্যু । আমরা যে সময়ে কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমীদারই দস্যু ছিলেন । ডাকুইন বলেন মানব জাতি বামরদিগের প্রপৌত্র । . . . . . কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্বপুরুষগণের এই অত্যাতি ওনিরা, বোধ হয়, কোন জমীদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না । বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগোরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না ? কেন না অস্ত্র টানিতে পাই, অনেক দস্যুবংশজাতই গোরবে প্রধান । তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর,



পরপুরুষেরাই বংশমর্যাদার পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাহারা বংশমর্যাদার বিশেষ গর্ব করিতে চাহেন, তাহারা নর্মান বা স্কেনেনবীর নাবিক দম্পাদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশেরই বিশেষ মর্যাদা ছিল; তাহারা গোচোর; 'বিরিাটের উত্তরগোগৃহে গোত্র চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুই এক বাঙ্গালি জমীদারের একরূপ কিঞ্চিৎ বংশমর্যাদা আছে।

তবে অতীত প্রাচীন জমীদারের সঙ্গে প্রতাপের দম্পত্যের কিছু প্রভেদ ছিল। 'আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্ত বা হৃদ্যস্ত শত্রুর দমন জন্তই প্রতাপ দম্পত্যদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পবনাপহরণ বা পরপীড়ন জন্ত করিতেন না; এমন কি, দুর্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্তই দম্পত্য করিতেন। প্রতাপ আবার সেই পথে গমনোন্মত হইলেন।

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইল, সেই রাতি প্রভাতে প্রতাপ, নিদ্রা হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; কিছুকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া, তাহাকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল। প্রতাপ নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রতাপ জানিতেন, এখন তাহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে।

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি। আমি

ধর্ম ভিন্ন অধর্মপথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্ত মরিয়াছে তাহা আমার নিবার্য কারণ নহে। অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ খাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁতাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গাসঙ্করণ ঘটত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লরেঞ্জ ফষ্টের উপর রাগ হইল—সে, শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে এ সকল কিছুই ঘটত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালার না আসিলে শৈবলিনী লরেঞ্জ ফষ্টের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসংকার করিতে হইবে—নহিলে সে আবার বাচিবে—গোর দিলে মাটি কুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন, যে ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্তব্য, কেন না ইহাঙ্গের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, প্রতাপ সেই ছিপে নুঙ্গেরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপ, চুর্গমধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতাপের আশ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই

ভাস্করদিগকে বাঁধালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না ? কষ্টের কি দ্বত হইবে না ?

তার পর মনে ভাবিলেন, বাহার/বেমন শক্তি, তাহার কর্তব্য এ কার্য্যে নবাবের সাহায্য করে। কাঠবিড়ালেও সমুদ্র বাধিতে পারে।

তার পর মনে ভাবিলেন, আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না ? আমি কি করিতে পারি ?

তার পর মনে ভাবিলেন, আমার সৈন্ত নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে—দস্যু আছে। তাহাঁদিগের দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে ?

ভাবিলেন, আর কোন কার্য্য না হউক, লুঠপাঠ হইতে পারে। যে গ্রামে ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের রশদ লইয়া যাইতেছে, সেই খানে রশদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের দ্রব্য সামগ্রী যাইতেছে, সেই খানে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ-সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ-বিনাশের সামান্ত উপায় মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ, এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যতদূর পারি, ততদূর তাহা করিব।

তারি পর ভাবিলেন, আমি কেন এত করিব ? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্বনাশ করিয়াছে ; দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরিয়াছে ; তৃতীয়, আমাকে করেন প্রাণিয়াছিল ; চতুর্থ, এইরূপ অনিষ্ট আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে ; পঞ্চম, নবাবের এ

উপকার করিতে পারিলে হই এক খানা বড় বড় পরগণা পাইতে পারিব ।

অতএব আমি ইহা করিল ।

প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোবামোদ কাররা নবাবের গলে সাক্ষাৎ করিলেন । নবাবের সঙ্গে তাঁহার কি কি কথা হইল, তাহা অপ্ৰকাশ রহিল । নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

অনেক দিনের পর, তাঁহার স্বদেশে আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল, কিন্তু রূপসী শৈবলিনীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া হুঃখিত হইল । প্রতাপ আসিয়াছেন শুনিয়া সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিল । সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া নিতান্ত হুঃখিতা হইল, কিন্তু বলিল, “যাহা হইবামু তাহা হইরাছে । কিন্তু শৈবলিনী এখন সুখী হইল । তাহার বাঁচা অপেক্ষা এরাই মে সুখের, তা আর কোন্ মুখে না বলিব ?”

প্রতাপ রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, পুনর্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন । অচিরে দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল যে, মুন্সের হইতে কাটোয়া পর্যন্ত যাবতীর দম্মা ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছে ।

তিনিরা গুরুগন্থ খাঁ চিন্তাবৃত্ত হইলেন ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শৈবলিনী কি করিল ।

মহাক্ষকারময় পর্বতগুহা—পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলম্ব্যায় শুইয়া শৈবলিনী । মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন । বড় বৃষ্টি গামিরা গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ । নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলে তেমনই অন্ধকার । নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্বতস্থ রক্ত-পাণে বিন্দু বিন্দু বারি গুহাতলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ শব্দ করিতেছে । আর যেন একান জীব, মনুষ্য কি পশু—কে জানে ?—সেই গুহা মধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইলেন । ভয় ? তাহাও নহে । মনুষ্যের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে—শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন । শৈবলিনীর ভয় নাই—কেন না জীবন তাহার পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় ভাব হইয়া উঠিয়া ছিল—কেলিতে পারিলেই ভাল । বাকি যাহা—সুখ, ধর্ম, জাতি, কুল, মান, সকলই গিয়াছিল—আর যাইবে কি ? কিসের ভয় ?

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল যে আশা হৃদয়মধ্যে সঘন্থে, সঙ্কোপনে, পালিত করিয়াছিল, সেইদিন, বা তাহার পূর্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল ; যাহার অন্ত সর্বভ্যাগিনী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও ত্যাগ করিয়াছে ; চিত্ত নিতান্ত বিকল,

নিভান্ত বলশূন্য। আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে, পথশ্রান্তি, পর্ত্তারোহণশ্রান্তি; বাত্যাটুজনিভ পীড়াতোগ; শরীরও নিভান্ত বিকল, নিভান্ত বলশূন্য। তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিরাই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানবচিত্ত আর কতকণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতন হইয়া অর্ধনিদ্রা-ভিভূত, অর্ধজাগ্রদানস্থায় রহিল। গুহাতলস্থ উপলব্ধ সকলে পৃষ্ঠদেশ ব্যধিত হইতেছিল।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্ত্য বিস্মৃত হইলে, শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃত মদী। কিন্তু মদীতে জল নাই—শূন্য দ্বারিত করিয়া ক্রধিরের স্রোতঃ বহিতেছে। তাহাতে অহি, গলিত নরদেহ, নৃশূণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুস্তীরাকৃত শীব সকল—চর্ম মাংসাদি, বর্জিত—কেবল অহি, ও বৃহৎ, ভীষণ, উজ্জল চক্ষুঃবিশিষ্ট—ইত্যন্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিত্তা থাইতেছে। শৈবলিনী, দেখিল যে, যে মহাকার পুরুষ তাহাকে পর্ত্ত হইতে ধৃত, করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নদীতীরে আনিয়া বসাইল। সে প্রদেশে, রোদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোক মাত্র নাই—অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা বাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। ক্রধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতো-বাহিত কঙ্কালমালা, অহির কুস্তীরগণ, সকলই ভীষণাঙ্ককারে দেখা বাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্ত্তে লৌহ-মৃচী সকল অগ্রভাগ উর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকার পুরুষ সেই খানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন।

পারের কোন উপায় নাই। নোকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, সঁতার দিয়া পার হ, তুই সঁতার জানিস্—গঙ্গায়, প্রতাপের সঙ্গে অনেক সঁতার দিয়াছি। শৈবলিনী এই কধিরের নদীতে কি প্রকারে সঁতার দিবে? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত বেত্র প্রহার জগু উত্থাপ করিলেন। শৈবলিনী সম্মুখে দেখিল যে, সেই বেত্র জ্বলন্ত লোহিত লোহনির্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দম্ব ভইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া কধিরের নদীতে বাঁপ দিল। অমনি অস্থিমা কুন্তীর সকল তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সঁতার দিয়া 'চলিল'; কধির-স্রোতঃ বদনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে কধিরস্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিলেন—ডুবিলেন না। মধ্যে মধ্যে পুষ্টিগন্ধবিশিষ্ট পলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কূলে উঠিয়া চাহিয়া দেখিয়া, "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার সীমা নাই, ক্ষমতার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত যে তাহা চক্ষে প্রবেশ মাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল—বিবসংযোগে যেরূপ আধা সম্ভব, চক্ষু, সেইরূপ জ্বালা ধরিল। নাসিকায় এরূপ ভয়ানক পুষ্টিগন্ধ প্রবেশ করিল যে, শৈবলিনী নাসিকা আবৃত করিয়াও উন্নত হইতে পারিল না। কণে, অতি কঠোর

কর্কশ, ভয়াবহ শব্দ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল—  
 জননবিদারক আর্কনাদ, পৈশাচিক হাস্ত, বিকট হুকার, গর্জত-  
 বিদারণ, অশনিপতন, শিলাঘর্ষণ, জলকল্লোল, অগ্নিগর্জন মুম্বুর  
 ক্রন্দন, সকলই এককালে শ্রবণ বিনোদ করিতে লাগিল। সম্মুখ  
 হইতে ক্ষণে ক্ষণে ভীতনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে,  
 তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার জ্বালা দগ্ধ করিতে লাগিল—  
 কখনও বা শীতে শতসহস্র ছুরিকাঘাতে যু জ্বালা অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন  
 করিতে লাগিল। শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল, “প্রাণ যায় !  
 রক্ষা কর !” তখন অসহ্য পুষ্টিগন্ধবিশিষ্ট এক বৃহৎ কদম্বা কীট  
 আসিয়া শৈবলিনীর মুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৈবলিনী  
 তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “রক্ষা কর ! এ নরক !  
 এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই ?”

মহাকায় পুরুষ বলিলেন, “আছে।” স্বপ্নাবস্থায় আত্মকৃত  
 চীৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও  
 ভ্রান্তি যায় নাই—পৃষ্ঠে প্রস্তর কুটিতেছে। শৈবলিনী ভ্রান্তিবশে  
 জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিল,

“আমার কি হবে ! আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই ?”

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, “আছে ?”

এ কি এ ? শৈবলিনী কি সত্য সত্যই নরকে ? শৈবলিনী,  
 বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল “কি উপায় ?”

গুহামধ্য হইতে উত্তর হইল, “দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অবলম্বন  
 কর।”

এ কি দৈববাণী ? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিল,  
 “কি সে ব্রত ? কে আমার শিখাইবে ?”



উত্তর—“আমি নিখাইব ।”

শৈ। তুমি কে ?

উত্তর—“ব্রত গ্রহণ কর ।”

শৈ। কি করিব ?

উত্তর—“তোমার ও চীনবাস ত্যাগ করিয়া, আমি যে বসন দিই তাই পর । হাত বাড়াইও ।”

শৈবলিনী হাত বাড়াইল । প্রসারিত হস্তের উপর একখণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল । শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আর কি করিব ?”

উত্তর—তোমার যন্ত্রণার কোথায় ?

শৈ। বেদগ্রাম । সেখানে কি যাইতে হইবে ?

উত্তর—হাঁ—হুগিরা গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিবে ।

শৈ। আর ?

উত্তর—ভূতলে শয়ন করিবে ।

শৈ। আর ?

উত্তর—ফলমূলপত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না । একবার ভিন্ন খাইবে না ।

শৈ। আর ?

উত্তর—জটাধারণ করিবে ।

শৈ। আর ?

উত্তর—একবার মাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবে । ভিক্ষাকালে গ্রামে যাম্বে আপনায় পাপ কীর্তন করিবে ।

শৈ। আমার পাশ্চ বে বলিবাত্র নর ! আর কি প্রার্থিত নাই ?

উত্তর—আছে।

শৈ। কি ?

উত্তর—মরণ।

শৈ। ত্রুত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে ?

শৈবলিনী কোত্ত উত্তর পাইল না। তখন শৈবলিনী সকাৎতরে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি যেই হউন, জানিতে চাহি না। পক্ষতের দেবতা মনে করিয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর একটা কথায় উত্তর করুন, আমার স্বামী কোথায় ?”

উত্তর—কেন ?

শৈ। আর কি তাঁহার দর্শন পাইব না ?

উত্তর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈ। দ্বাদশ বৎসর পরে ?

উত্তর—দ্বাদশ বৎসর পরে।

শৈ। এ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া কতদিন বাচিব ? যদি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে মরিয়া যাউ ?

উত্তর—তবে মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈ। কোন উপায়েই কি তৎপূর্বে সাক্ষাৎ পাইব না ? আপনি দেবতা, অবশ্য জানেন।

উত্তর—যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ, দিনরাত্র কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্ত কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাত দিন, কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া কলম্বাহরণ করিও ; তাহাতে

‘পরিতোষজনক ভোজন করিও না—যেন ক্ষুধানিবারণ না হয় ।  
কোন মনুষ্যের নিকট যাইও না—বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ  
হইলেও কণা কহিও না । যদি এই অন্ধকার গুহার সপ্তাহ  
অবস্থিতি করিয়া, সরল চিত্তে অবিরত অনন্তমন হইয়া কেবল  
স্বামীর ধ্যান কর, তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে ।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাতাস উঠিল ।

শৈবলিনী তাহাই করিল—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির  
হইল না—কেবল এক একবার দিনান্তে ফলমূলান্বেষণে বাহির  
হইত । সাতদিন মনুষ্যেব সঙ্গে আলাপ করিল না । প্রায়  
অনশনে সেই বিকটান্ধকারে মনঃশ্রিয়বৃত্তি হইয়া স্বামীর  
চিন্তা করিতে লাগিল—কিছু দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে  
পায় না, কিছু স্পর্শ করিতে পায় না । ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ—মন  
নিরুদ্ধ—‘সর্বত্র স্বামী । স্বামী চিন্তাবৃত্তি সমূহের একমাত্র অবলম্বন  
হইল । অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পায় না—সাত দিন সাত  
রাত কেবল আশ্রিমুখ দেখিল । ভীম নীরবে আর কিছু শুনিতে  
পায় না—কেবল স্বামীর জ্ঞানপরিপূর্ণ, স্নেহকিচলিত, বাক্যা-  
লাপ শুনিতে পাইল—আশ্রয় কেবলমাত্র তাঁহার পুষ্পপাঞ্জের

পুষ্পাশির গন্ধ পাইতে লাগিল—তবে কেবল চন্দ্রশেখরের আদ-  
রের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিল। আশা আর কিছুতে  
নাই—আর কিছুতে ছিল না, স্বামিসন্দর্শন কামনাতেই রহিল।  
স্বতি কেবল অশ্রুশোভিত, প্রশস্তললাটপ্রমুখ বদনমণ্ডলের  
চতুঃপার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল—কণ্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরো যেমন দ্রুত  
সুগন্ধিপুষ্পকুতলে কণ্ঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনই ঘুরিয়া  
বেড়াইতে লাগিল। যে এ ত্রৈত্যের পরামর্শ দিয়াছিল, সে  
মনুষ্যচিত্তের সর্বাত্মক সন্দেহ নাই। নিষ্কল, নীরব, অন্ধকার,  
মনুষ্যসন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্রিষ্ট কুখাপীড়িত;  
চিত্ত অন্ধ চিন্তাশূন্য; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা  
যায়, তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে। এই  
অবস্থার, অবসন্ন শরীরে, অবসন্ন মনে, একাগ্রচিত্তে, স্বামীস্থান  
করিতে করিতে শৈবলিনী বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

বিকৃতি ন! দিব্য চক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—অস্তুরের ভিতর  
অস্তুর হইতে দিব্য চক্ষু চাহিয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ কি রূপ!  
এই দীর্ঘ শালতরুনির্মিত, সুভূষাবিশিষ্ট, সুন্দরগঠন, সুকুমারে  
বলময় এ দেহ যে রূপের নশ্বর! এই যে ললাট—প্রশস্ত,  
চন্দনচর্চিত, চিত্তায়েথা বিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের  
রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে  
প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নরীন—জলি-  
তেছে; হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিফারিত,  
তীব্রজ্যোতিঃ, স্থির, মেঘময়, কল্পাময়, ঈশ্বরকল্পিত, সর্বত্র  
তত্ত্বজিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আধি-  
ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম? এই যে স্বপ্নর,

সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্রশোভিত শালতরু,—মাধবী-  
 জড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাণ্ড পৰ্বত, অর্ধেক সৌন্দর্য্য অর্ধেক  
 শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ  
 রাধা আধ শ্রাম—আধ আশা আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ আধ  
 ছায়া—আধ বহি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না  
 দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—  
 পরিষ্কৃত পরিষ্কৃত, হান্তপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, মেহপরিপ্লুত,  
 মৃদু, মধুর, পরিগুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন  
 মরিলাম—কেন কুল চারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্র-  
 স্থিত মল্লিকারানিহুতা, মেঘমণ্ডলে বিহ্বান্তুলা, দুর্কণ্ডসরে  
 জর্গোৎসবতুল, আমার সুধস্বপ্নতুলা—কেন দেখিলাম না, কেন  
 মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুজিলাম না? সেই যে  
 ভালবাসা সমুদ্রতুলা—অপার অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার  
 বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্য-  
 ময়—চাঁকল্যে কলপ্রাবী, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজের.  
 ভরস্কর,—কেন বুজিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—  
 কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না! কে আমি? তাঁহার  
 কি যোগ্য—বালিকা, অজ্ঞান, অনাকর, অসৎ, তাঁহার মহিমা-  
 জ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শব্দুক,  
 কুসুমের ফীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে  
 আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিবৃতি, সুখে বিষ,  
 আশার অবিবাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দম  
 মৃগালে কণ্টক, পবন ধূলি, অনলে পতঙ্গ! আমি মজিলাম—  
 মরিলাম না কেন?"

• বে বলিয়াছিল, এইরূপে আমি যান কর, সে অনন্ত মানব-  
জনম সমুদ্রের কাঙারী—সব জানে । • জানে যে, এই মস্ত  
চিরপ্রবাহিত নদী অস্ত্র খালে চালান বার,—জানে যে, এ বস্ত্রে  
পাহাড় ভাঙ্গে, এ গর্ভে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মস্ত্রে বায়ু ত্তস্তিত  
হয় । শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড়  
ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু ত্তস্তিত হইল । শৈবলিনী প্রতাপকে  
ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিয়া ।

মহাশয়ের ইচ্ছায়ের পথ রোধ কর—ইচ্ছায় বিলুপ্ত কর—  
মনকে বাধ,—বাধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অস্ত্র পথ বন্ধ  
কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন, কি করিবে ? সেই এক  
পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে । শৈবলিনী  
পঞ্চম দিবসে আহরিত • ফল মূল খাইল না—ষষ্ঠ দিবসে,  
ফল মূল আহরণে গেল না—সপ্তম দিবস প্রাতে ভাবিল, স্বামি-  
দর্শন পাই • না পাই—অস্ত্র মরিব । সপ্তম রাত্রে মনে করিল,  
জন্মমধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগ্যাসনে  
বসিয়া আছেন ; • শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুণ্ণ-  
করিতেছে ।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব । শিলাককর্ণ গুহামধ্যে,  
একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল ।  
সে নানা বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল । কখনও দোঁখল, সে  
ভরকর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ  
অযুত কণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে ;  
অযুত মুণ্ডে মুখব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে, গিলিতে আসি-  
তেছে, সকলের মিলিত নিশ্বাসে প্রবল • বাতাস ঝার শব্দ

হইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের কণার চন্দ্র  
স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্প সকল বস্ত্রার জলের  
শ্রায় সরিয়া গেল। কখনও দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পৰ্ব্বতাকার  
অগ্নি জলিতেছে; আকাশে তাহার শিখা উঠিতেছে; শৈবলিনী  
তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; এমন সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া  
সেই অগ্নিপৰ্ব্বতমধ্যে এক গণ্ডুয় জল নিক্ষেপ করিলেন, অমনি  
অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল; শীতল পবন বহিল, কুণ্ডলমধ্যে স্বচ্ছ-  
সলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল, তীরে কুসুম সকল বিকশিত  
হইল, নদীজলে বড় বড় পদ্মফুল ফুটিল—চন্দ্রশেখর তাহার  
উপর দাঁড়াইয়া আসিয়া যাইতে লাগিলেন। কখনও দেখিল, এক  
প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলিয়া পৰ্ব্বতে  
লইয়া যাইতেছে; চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র হইতে  
একটি পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন, ব্যাঘ্র তখনই  
ভিন্নশিরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, শৈবলিনী দেখিল তাহার মুখ  
ফষ্টরের মুখের শ্রায়।

রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে  
অথচ জ্ঞান আছে। দেখিলেন পিশাচে তাহার দেহ লইয়া  
অন্ধকারে শূন্যপথে উড়িতেছে। দেখিলেন, কত কুকুমেষের  
সমুদ্র, কত বিদ্যাদগ্নিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ ধরিয়া উড়াইয়া  
লইয়া যাইতেছে। কত গগনবাসী অঙ্গরা কিন্নরাদি মেঘ-  
ধরজ মধ্য হইতে মুখমণ্ডল উদ্ভিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া  
হাসিতেছে। দেখিলেন, কত গগনচারিণী জ্যোতির্পরী দেবী  
বর্ণ-মেঘে আরোহণ করিয়া, স্বর্ণকলেবর বিফাতের মালায় ভূষিত  
করিয়া, কুকুৎশাবৃত ললাটে তারার মালা ঐখিত করিয়া

বেড়াইতেছে,—শৈবলিনীর পাপময় দেহস্পষ্ট পবনস্পর্শে তাহাদের  
জ্যোতিঃ নিবিয়া শ্বাইতেছে । কত গগনচারিণী তৈরবী রাক্ষসী,  
অন্ধকারবৎ শরীর প্রকাণ্ড অন্ধকার মেঘের উপর হেলাইরা  
ভীম বাতায় ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতেছে,—শৈবলিনীর পুতিগন্ধ-  
বিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখের জল পড়িতেছে, তাহারা  
হাঁ করিয়া আহ্বান করিতে আসিতেছে । দেখিলেন, কত দেব  
দেবীর বিমানের, কৃষ্ণতাশূন্য উজ্জ্বললোকময়ী ছায়া মেঘের  
উপর পড়িয়াছে ; পাছে পাশিষ্ঠা শৈবলিনীশবের ছায়া বিমানের  
পবিত্র ছায়ায় লাগিলে শৈবলিনীর পাপক্ষয় হয়, এই ভয়ে  
তাহারা বিমান সরাইয়া লইতেছেন । দেখিলেন, নক্ষত্রসুন্দরী-  
গণ নীলাম্বর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে  
কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পবনস্পর্শকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—  
বলিতেছে,—“দেখ, ভগিনী, দেখ, মনুষ্য-কীটের মণী আবার  
অসতী আছে !” • কোন তারা শিরিষা চক্ষু বুজিতেছে : কোন  
তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে ; কোন তারা অসতীর নাম  
শুনিয়া ভয়ে নিশ্বিয়া বাইতেছে । পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া  
উর্কে উঠিতেছে, তার পর অম্লও উর্কে, আরও মেঘ, আরও তারা  
পার হইয়া আরও উর্কে উঠিতেছে । অতি উর্কে উঠিয়া সেই  
ধান হইতে শৈবলিনীর দেহ নরককূণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া  
উঠিতেছে । যেখানে উঠিল, সেখানে অন্ধকার, শীত,—মেঘ  
নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই । শব্দ  
নাই—কিন্তু অকস্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে, অতি ভীম কল-  
কল ধরবর শব্দ শুনা বাইতে লাগিল—যেন অতিদূরে, অধো-  
ভাগে, শত সহস্র সমুদ্র এককালে গর্জিতেছে । পিশাচেরা



বলিল, ঐ নরকের কোলাহল শুনা যাইতেছে, এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও । এই বলিয়া পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল। শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে, পড়িতে লাগিল । ক্রমে ঘূর্ণগতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুস্তকারের চক্রের জ্ঞান, ঘুরিতে লাগিল । শবের মুখে, নাসিকায়, রক্তবমন হইতে লাগিল । ক্রমে নরকের গর্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, পুতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ সজ্ঞানমুতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল । তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কণ বধির হইল, তখন সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল, মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—“কোথায় তুমি, স্বামী ! কোথায় প্রভু ! জীজ্ঞার্তির জীবন সহায়, আরামনার দেবতা, সর্ব সর্ব-মঙ্গল ! কোথায় তুমি চন্দ্রশেখর ! তোমার চরণাবিন্দে সহস্র, সহস্র, সহস্র প্রণাম ! আমার রক্ষা কর । তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কেনি দেবতার আমার রক্ষা করিতে পারে না—আমার রক্ষা কর । তুমি আমার রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া চরণস্পর্শ আমার মস্তকে তুলিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব ।”

তখন, অন্ধ, বধির, মুতা শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল যে, কে তাহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাঁহার অঙ্গের সৌরভে দিক্ পূর্বিল । সেই দ্রুত নরক-রব, সহসা অন্তর্হিত হইল, পুতিগন্ধের পরিবর্তে কুসুমগন্ধ ছুটিল । সহসা শৈবলিনীর ঘিরিতা ঘুটিল—চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর

বাঁধ হইল—এ মৃত্যু নহে, জীবন ; এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত ।  
শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল ।

চন্দ্রশেখর করিয়া দেখিল, গুহামধ্যে অন্ন আলোক প্রবেশ  
করিয়াছে ; বাহিরে পক্ষীর প্রভাতকুঞ্জন শুনা যাইতেছে—কিন্তু  
একি এ ? কাহার অঙ্কে তাঁহার মাথা রহিয়াছে—কাহার মুখ-  
মণ্ডল, তাঁহার মস্তকোপরি, গগনোদিত পূর্ণচন্দ্রবৎ এ প্রভাতাঙ্ক-  
কারকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে ? শৈবলিনী চিনিলেন,  
চন্দ্রশেখর—ব্রহ্মচারী বেশে চন্দ্রশেখর ! :

### • চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

নৌকা ডুবিল ।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “শৈবলিনী !”

শৈবলিনী উঠিয়া বলিল, “চন্দ্রশেখরের, মুখপানে চাহিল ;  
মাথা ঘুরিল ; শৈবলিনী পড়িয়া গেল ; মুখ চন্দ্রশেখরের চরণে  
বর্ষিত হইল । চন্দ্রশেখর তাতাকে ধরিয়৷ তুলিলেন । তুলিয়া  
আপন শরীরের উপর ভর করিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন ।

শৈবলিনী কাদিতে লাগিল, উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে, কণ্ঠদ্বিতে,  
চন্দ্রশেখরের চরণে পুনঃপতিত হইয়া বলিল, “এখন আমার দশা  
কি হইবে !”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে  
কেন ?”

শৈবলিনী চক্কু মুছিল, রোদন সম্বরণ করিল—স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, “বোধ হয় আমি আর অতি অল্প দিন বাঁচিব।” শৈবলিনী শিহরিল—স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল—কণেক কপালে হাত দিয়া, নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—“অল্প দিন বাঁচিব—মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করবে? কেন বিশ্বাস করিবে? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি?”

শৈবলিনী কাতরতার নিকট হাসি হাসিল।

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈ। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কঠোর সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে কঠোর আনার নিকট লোক প্রবেশ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি ডুয়াইলেন; ধীরে ধীরে গাত্রোথান করিলেন, গমনোন্মুখ হইয়া মুহুমুধুর স্বরে বলিলেন,

“শৈবলিনী, দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।”

শৈবলিনী হাতখোড় করিল;—বলিল, “আর একবার বসো! বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই।” আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল—“বসো—তোমায় কণেক দেখি।”

চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিল, “আত্মহত্যার পাপ আছে কি ?”  
শৈবলিনী স্থিরদৃষ্টে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিল, তাহার প্রফুল্ল  
নয়নপদ্ম জলে ভাসিতেছিল ।

চন্দ্র । আছে । কেন মরিতে চাও ?

শৈবলিনী শিহরিল । বলিল, “মরিতে পারিব না—সেই  
নরকে পড়িব ।”

চন্দ্র । প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক হইতে উদ্ধার হইবে ।

শৈ । এ মনোনরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

চন্দ্র । কে ?

শৈ । এ পূর্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন । তাঁহারা  
আমাকে কি করিয়াছেন বুঝিতে পারি না—আমি রাত্রিদিন  
নরক স্থপ্ন দেখি ।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি জ্বালাপ্ৰাপ্তে জ্বালাপিত  
হইয়াছে—যেন দূরে কিছু দেখিতেছে । দেখিলেন, তাহার  
শীর্ণ বদনমণ্ডল বিস্তৃত হইল—চক্ষুঃ বিক্ষারিত, পলকবহিত  
হইল—নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত, বিক্ষারিত হইতে লাগিল—শরীর  
কণ্টকিত হইল—কাঁপিত লাগিল । চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা  
করিলেন,

“কি দেখিতেছ ?”

শৈবলিনী কথা কহিল না, পূর্ববৎ চাহিয়া রহিল । চন্দ্রশেখর  
জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কেন ভয় পাইতেছ ?”

শৈবলিনী প্রস্তরবৎ ।

চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেকক্ষণ নীরব হইয়া

শৈবলিনীৰ মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—“প্রভু! রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী! তুমি না রাখিলে কে রাখে?”

শৈবলিনী মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নিখর হৃদতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিক্তন করিলেন। উত্তরীয়ে দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল। শৈবলিনী উঠিয়া বসিল। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “কি দেখিতেছিলে?”

শৈ। সেই নরক!

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে। শৈবলিনী কণ পরে বলিল,

“আমি মৰিতে পারিব না—আমার ঘোরতর নরকের ভয় হইয়াছে। মরিলেই নরকে যাইব। আমাকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু একাকিনী, আমি দ্বাদশ বৎসর কি প্রকারে বাঁচিব? আমি চেতনে অচেতনে কেবল নরক দেখিতেছি।”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “চিন্তা নাই—উপবাসে এবং মানসিক ক্লেশে, এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ইহাকে বায়ুরোগ বলেন। তুমি বেদগ্রামে গিয়া গ্রামপ্রান্তে কুটার নির্মাণ কর। সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধারণ করিবেন—চিকিৎসা করিতে পারিবেন।”

সহসা শৈবলিনী চক্ষু মুদ্রিত—দখিল, গুহাপ্রান্তে সুন্দরী দাঁড়াইয়া, অন্তরে উৎসর্গা—অগ্নি তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে

দেখিল, সুন্দরী অতি দীর্ঘাকৃতা, ক্রমে তালবৃক্ষপরিমিতা হইল,  
 মতি ভরতরী ! দেখিল সেই গুহ্য প্রান্তে সহসা নরক সৃষ্ট হইল—  
 :সেই পুতিগন্ধ, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্জ্জন, সেই উত্তাপ, সেই ক্ষীত,  
 :সেই সর্পাঘা, সেই কদর্য কৌটরাশিতে গগন অন্ধকার !  
 :দেখিল, সেই নরকে পিশাচেরা কণ্টকের রজ্জ্বহস্তে, বৃশ্চিকের  
 :বত্রহস্তে নামিল--রজ্জ্বতে শৈবলিনীকে বাঁধিয়া, বৃশ্চিকবেদ্রে  
 প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল ; তালবৃক্ষ পরিমিতা  
 প্রস্তরময়ী সুন্দরী হস্তোত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে বলিতে  
 লাগিল—“মার ! মার ! আমি বারণ করিয়াছিলাম ! আমি  
 :নৌকা হইতে ফিরাইতে গিয়াছিলাম, শুনে নাই ! মার ! মার”  
 ষত পারিস মার ! আমি উত্তর পাপের সাক্ষী ! মার ! মার !”  
 শৈবলিনী যুদ্ধ করে, উন্নত আননে, সজল-নয়নে সুন্দরীকে মিনতি  
 করিতেছে . সুন্দরী গুনিতেছে না ; কেবল ডাকিতেছে, “মার !  
 মার ! অসতীকে মার ! আমি সতী, ও অসতী ! মার মার !”  
 শৈবলিনী আবার সেইরূপ দৃষ্টিস্থির লোচন বিফারিত করিয়া  
 বিস্তর মুখে, শুভ্রিতের জ্বার রহিল । চন্দ্রশেখর চিণ্ডিত হইলেন  
 —বুলিলেন, লক্ষণ ভাল নহে ? বুলিলেন,

“শৈবলিনী ! আমার সঙ্গে আইস !”

প্রথমে শৈবলিনী, গুনিতে পাইল না । পরে চন্দ্রশেখর,  
 তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া ছুই তিন বার সঞ্চালিত করিয়া  
 ডাকিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন, “আমার সঙ্গে আইস !”

সহসা শৈবলিনী, দাঁড়াইয়া উঠিল, অতি, ভীতবরে বলিল,  
 “চল, চল, চল, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, এখান হইতে শীঘ্র চল !”  
 বলিয়াই, বিলম্ব না করিয়া, গুহ্যদ্বারাদিমুখে ছুটিল, চন্দ্রশেখরের

প্রতীক্ষা না করিয়া, দ্রুতপদে চলিল। দ্রুত চলিতে, গুহার  
অস্পষ্ট আলোকে পদে শিলাখণ্ড বাজিল; পদাশ্রিত হইয়া  
শৈবলিনী ভূপতিতা হইল। আর শব্দ নাই। চন্দ্রশেখর  
দেখিলেন শৈবলিনী আবার মূর্ছিতা হইয়াছে।

তখন চন্দ্রশেখর, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া গুহা হইতে বাহির  
হইয়া, যথার পর্বতাগ্র হইতে অতি ক্রোণা নিকরিশী নিঃশব্দে  
জলোদ্গার করিতেছিল—তথায় আনিলেন। মুখে জলসেক  
কবাত, এবং অনাবৃত স্থানের অনবরুদ্ধ বায়ুস্পর্শে শৈবলিনী  
সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিল—বলিল,

“আমি কোথায় আসিয়াছি?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি।”

শৈবলিনী লিহরিল—আবার ভীতা হইল। বলিল, ‘তুমি  
কে?’ চন্দ্রশেখরও ভীত হইলেন। বলিলেন, “কেন এরূপ  
করিতেছ? আমি যে তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না  
কেন?”

শৈবলিনী হা হা করিয়া হাসিল, বলিল,

“স্বামী আমার সোঁপার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে ;

তেকাটাতে এলে, সখা, বুঝি পথ ভুলে ?

তুমি লরেন্স্ ফটর ?”

চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, যে দেবীর প্রভাতেই এই মনুষ্য-  
দেহ স্কন্দর। তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—  
বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার সুবর্ণ মন্দির অধিকার করিতেছে।  
চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদু স্বরে, কত আদরে  
আবার ডাকিলেন, “শৈবলিনী !”

শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, “শৈবলিনী কে ?” রসো রসো ! একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ । এক দিন রাতে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল ; মেয়েটি ব্যাঙ হয়ে বনে গেল । সাপটি ব্যাঙটিকে গিলিয়া ফেলিল । আমি স্বচক্ষে দেখেছি । ই! গা সাহেব ! তুমি কি লরেন্স ফষ্টর ?”

চন্দ্রশেখর গদগদকণ্ঠে সকাভরে ডাকিলেন, “গুরুদেব ! এ কি করিলে ? এ কি করিলে ?”

শৈবলিনী গীত গায়িল,

“কি করিলে প্রাণদখী, মনচোরে ধরিয়ে,

ভাসিল গীর্জিত-নন্দে ছুই কুল ভরিয়ে,”

বলিতে লাগিল, “মনচোর কে ? চন্দ্রশেখর । ধরিল কাঁকে ? চন্দ্রশেখরকে । ভাসিল কে ? চন্দ্রশেখর । ছুই কুল কি ? জানি না । তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন ?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “আমিই চন্দ্রশেখর ।”

শৈবলিনী ব্যাঙ্গীর ভাষা কাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল—কোন কথা না বলিয়া, কাঁদিতে লাগিল—কত কাঁদিল—তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহ প্রাবিত হইল । চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন । শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—

“আমি তোমার সঙ্গে যাউব ।”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “চল ।”

শৈবলিনী বলিল, “আমাকে মারিবে না !

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “না ।”



দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোথান করিলেন ।  
শৈবলিনীও উঠিল । চন্দ্রশেখর বিষমবদনে চলিলেন—উন্মাদিনী  
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—কখনও হাসিতে লাগিল—কখনও কঁাদিতে  
লাগিল—কখনও গায়িতে লাগিল ।



ଅନ୍ତରାଳ ଥାଉ ।







পঞ্চম খণ্ড ।

— ০০ —

প্রচ্ছাদন ।

— ০০ —

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

আমিরটের পরিণাম ।

মুর্শিদাবাদে আসিয়া, ইংরেজের সোঁকাসকল পোঁড়ল ।  
মীরকাসেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁর নিকট সংবাদ আসিল  
যে, আমিরট পৌঁছিয়াছে ।

মহাসমারোহের সহিত আসিয়া মহম্মদ তকি আমিরটের  
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন । আমিরট আপ্যায়িত হইলেন । মহম্মদ  
তকি খাঁ পরিশেষে আমিরটকে আহায়াৎ নিমন্ত্রণ করিলেন ।  
আমিরট অগত্যা স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রকৃতমনে নহে ।

এ দিকে মহম্মদ তকি, দূরে অলক্ষিতরূপে গ্রহণী নিযুক্ত করিলেন—ইংরেজের নৌকা খুলিয়া না যায় ।

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে, ইংরেজেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, নিমন্ত্রণে যাওয়া কর্তব্য কি না । গলটন ও জন্সন এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, ভয় কাহাকে বলে, তাহা ইংরেজ জানে না, জানাও কর্তব্য নহে । সুতরাং নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে । আমিয়ট বলিলেন, যখন ইহাদেব সঙ্গে যুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছি, এবং অসম্ভাব যত দূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন আবার ইহাদিগের সঙ্গে আহার ব্যবহার কি ? আমিয়ট স্থির করিলেন নিমন্ত্রণে যাইবেন না ।

এ দিকে যে নৌকার দলনী ও কুল্‌সম্ বান্ধিবরূপে সংরক্ষিতা ছিলেন, সে নৌকাতেও নিমন্ত্রণের সংবাদ পৌঁছিল । দলনী ও কুল্‌সম্ কানে কানে কথা কহিতে লাগিল । দলনী বলিল, 'কুল্‌সম্—ওনিতেছ ? বুঝি মুক্তি নিকট ।'

কু। কেন ?

দ। তুই যেন কিছুই বুঝিস্ না ; যাহারা নবাবের বেগমকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে—তাহাদের যে, নবাবের পক্ষ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, ইহার ভিতর কিছু গুঢ় অর্থ আছে । বুঝি আজি ইংরেজ মরিবে !

কু। তাতে কি তোমার আশ্লাদ হইয়াছে ?

দ। নহে কেন ? একটা রক্তাক্তি না হইলেই ভাল হয় । কিন্তু যাহারা আমাকে অনর্থক কয়েদ করিয়া আনিয়াছে তাহারা মরিবে যদি আমরা মুক্তি পাই, তাহাতে আমার আশ্লাদ বৈ নাই ।

কু। কিন্তু মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন ? আমাদের আটক রাখা ভিন্ন ইহাদের আর কোন অভিসন্ধি দেখা যায় না । আমাদের উপর আর কোন দোষাত্ম্য করিতেছে না । কেবল আটক । আমরা জীজ্ঞাতি, যেখানে যাইব সেইখানেই আটক ।

দলনী বড় রাগ কুরিল । বলিল, আপন ঘরে আটক থাকিলেও আমি দলনী বেগম, ইংরেজের নোকার আমি বাদী । তোমার সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না । আমাদের কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে, বলিতে পারিস্ ?”

কু। তাত বলিয়াই রাখিয়াছে ! নুজেরে যেমন হে সাহেব ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনই নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি । হে সাহেবকে ছাড়িয়া দিলেই আমাদেরকে ছাড়িয়া দিবে । হে সাহেবের কোন অনিষ্ট ঘটিলেই আমাদেরও অনিষ্ট ঘটবে ; নহিলে ভয় কি ?

দলনী আরও রাগিল, বলিল, “আমি তোমার হে সাহেবকে চিনি না, তোমার ইংরেজের গোঁড়ামি শুনিতে চাহি না । ছাড়িয়া দিলেও তুমি বুঝি যাইবি না ?”

কুলসম্ রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিল, “যদি আমি না যাই, তবে তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাও ?”

দলনীর রাগ বাড়িতে লাগিল, বলিল, “তাও কি সাধ না কি ?”

কুলসম্ গম্ভীরভাবে বলিল, “কপালের লিখন কি বলিতে পারি ?”

দলনী অকুণ্ঠিত করিয়া, বড় জোরে একটা ছোট কিল উঠাইল । কিন্তু কিলটি আপাততঃ পুঞ্জি করিয়া রাখিল—হাফিল

না । দলনী আপন কর্ণের নিকট সেই কিলটি উখিত করিয়া—  
কুককেশ শুদ্ধ সংস্পর্শে যে কর্ণ, সন্মুখ প্রাক্ট কুহুমবৎ শোভা  
পাইতেছিল, তাহার নিকট কোমল কোরক তুল্য বহু মুষ্টি স্থির  
করিয়া, বলিল, “তোকে আমিষট্ দুই দিন কেন ডাকিয়া লইয়া  
গিয়াছিল, সত্য কথা বল ত ?”

কু। সত্য কথা ত বলিয়াছি, তোমার কোন কষ্ট হইতেছে  
কি না—তাহাই জানিবার জ্ঞাত । সাহেবদিগের ইচ্ছা, যত দিন  
আমরা ইংরেজের নোকায় থাকি, অশুখে স্বচ্ছন্দে থাকি । জগ-  
দীশ্বর করুন, ইংরেজ আমাদের না ছাড়ে ।

দলনী কিল আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া বলিল, “জগদীশ্বর  
করুন, তুমি লীভ মর ।”

কু। ইংরেজ ছাড়িলে, আমরা ফের নবাবের হাতে পড়িব ।  
নবাব তোমাকে ক্ষমা করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমার  
ক্ষমা করিবেন না, ইহা নিশ্চিত বুলিতে পারি । আমার এমন  
মন হয় যে, যদি কোথায় আশ্রয় পাই, তবে আর নবাবের হজুরে  
হাজির হইব না ।

দলনী রাগ ত্যাগ করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, “আমি অনন্ত-  
গতি । মরিতে হয়, তাহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব ।”

এ দিকে আমিষট্ আপনার আজ্ঞাধীন সিপাহীগণকে সজ্জিত  
হইতে বলিলেন । অনুসন্ বলিলেন,—“এখানে আমরা তত  
দলবান্ নহি—রসিডেন্সির নিকট নোকা লইয়া গেলে হয় না ?”

আমিষট্ বলিলেন, “যে দিন, একজন ইংরেজ দেশী  
লোকের ভরে পল্লইবে, সেই দিন ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য  
স্থাপনের আশা বিদূষ হইবে । এখান হইতে নোকা খুলিলেই

মুসলমান বুঝিবে যে, আমরা তরে পলাইলাম । দাঁড়াইয়া মরিষ সেও ভাল, তথাসি ভর পাইয়া পলাইব না । কিন্তু কষ্টের পীড়িত । শত্রুহন্তে মরিষে অক্ষম—অতএব তাহাকে রেসিডেন্সিতে বাইতে অনুমতি কর । তাহার নৌকার যোগম ও বিতীর জীলোকটিকে উঠাইয়া দাও । এবং দুই জন সিপাহী সঙ্গে দাও । বিবাদের স্থানে উহাদের থাকা অনাবশ্যক ।”

সিপাহিগণ সজ্জিত হইল, আমিরটের আজ্ঞানুসারে নৌকার মধ্যে সকলে প্রচুর হইয়া বসিল । কাঁপের বেড়ার নৌকার সহজেই ছিন্ন পাওয়া যায়, প্রত্যেক সিপাহী এক এক ছিন্নের নিকটে বন্ধক লইয়া বসিল । আমিরটের আজ্ঞানুসারে দলনী ও কুলসম্ কষ্টরের নৌকার উঠিল । দুই জন সিপাহী সঙ্গে কষ্টর নৌকা খুলিয়া গেল । দেখিয়া মহম্মদ তকির প্রহরীরা তাহাকে সংবাদ দিতে গেল ।

এ সংবাদ শুনিয়া এবং ইংরেজদিগের আসিবার সম্বন্ধ অতীত হইল দেখিয়া, মহম্মদ তাক, ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন । আমিরট উত্তর করিলেন যে, কারণ বলতঃ তাহার নৌকা হইতে উঠিতে অসম্ভব ।

দূত নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কিছু দূরে আসিয়া, একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল । সেই শব্দের সঙ্গে, তীর হইতে দশ বারটা বন্দুকের শব্দ হইল । আমিরট দেখিলেন, নৌকার উপর গুলি বর্ষণ হইতেছে এবং স্থানে স্থানে নৌকার ভিতরে গুলি প্রবেশ করিতেছে ।

তখন ইংরেজ সিপাহীরাও উত্তর দিল । উত্তর পক্ষে, উত্তরকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়াতে শব্দ হইতে পড়িল ।



কিন্তু উভয় পক্ষই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। মুসলমানেরা তীরস্থ গৃহাদির অন্তরালে লুকাইয়া ; ইংরেজ এবং তাহাদিগের সিপাহীগণ নোকামধ্যে লুকাইয়া । একদা যুদ্ধে বারুদ খরচ ভিন্ন অস্ত্র ফলের আওত কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন, মুসলমানেরা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, তরবারি ও বর্ষা হস্তে চীৎকার করিয়া আমিয়টের নোকাভিমুখে ধাবিত হইল। দোঁধিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ ইংরেজেরা ভীত হইল না।

স্থির চিন্তে নোকামধ্য হইতে দ্রুতাবতরণপ্রবৃত্ত মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিয়ট্ গল্‌ষ্টোন ও জনসন্, স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতিবারে, এক এক জনে এক এক জন যবনকে বালুকাশায়া করিতে লাগলেন।

কিন্তু যেরূপ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ যবন-শ্রেণীর উপর যবনশ্রেণী নামিতে লাগিল। তখন আমিয়ট্ বলিলেন, “আর আমাদের রক্ষার কোন উপায় নাই। আইস আমরা বিধাতা নিপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি।”

ততক্ষণে মুসলমানেরা গিয়া আমিয়টের নোকা উঠিল। তিন জন ইংরেজ এক হইয়া এককালীন, আওয়াজ করিলেন। ত্রিশূলবিভিন্নের ত্রায় নোকাক্রান্ত যবনশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নোকা হইতে জলে পড়িল।

আরও মুসলমান নোকার উপর উঠিল। আরও কতকগুলি মুসলমান মুদগরাদি লইয়া নোকার তলে আঘাত করিতে লাগিল। নোকার তলদেশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ার, কল কল শব্দে তরঙ্গী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।

আমিয়ট্ সঙ্গোদিগকে বলিলেন, “গোমেবাদির ত্রায় জলে

ডুকিয়া মরিব কেন ? বাহিরে আইস, বীরের স্তার অস্ত্রহস্তে •  
মরি ।”

তখন তরবারি হস্তে তিন জন ঈংরেজ অকুতোভয়ে, সেই  
অগণিত যবনগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল । একজন যবন,  
আমিরটকে সেলাম করিয়া বলিল, “কেন মরিবেন ? আমাদিগের  
সঙ্গে আসুন ।”

আমিরট বলিলেন, “মরিব । আমরা আজি এখানে মরিলে,  
ভারতবর্ষে যে আগুন জলিবে, তাহাতে মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস  
হইবে । আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা  
তাহাতে সহজে রোপিত হইবে ।”

“তবে মর ।” এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে  
আমিরটের মূণ চিরিয়া ফেলিল । • দেখিয়া কিপ্রহস্তে গুল্‌ষ্টন  
সেই পাঠানের মূণ স্বকচুত করিলেন ।

তখন দশ বার জন যবনে গলষ্টনকে ঘেরিয়া প্রহার করিতে  
লাগিল । এবং অচিরে, বহলোকের প্রহারে আহত হইয়া  
গল্‌ষ্টন ও জন্সন, উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া নৌকার উপর  
পড়িলেন ।

তৎপূর্বেই কষ্টর নৌকা খুলিয়া গিয়াছিল ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

আবার সেই ।

যখন রামচরণের গুলি খাইয়া লরেন্স্ ফটর গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন প্রতাপ বজ্রা গুলিয়া গেলেন পর, হাতি-রারের নোকার দুনিয়া জলে কাঁপ দিয়া পড়িয়া, ফটরের দেহের সন্ধান করিয়া উঠিয়াছিল; সেই নোকার পাশ দিয়াই ফটরের দেহ ভাঙিয়া বাইতছিল। তাহার ফটরকে উঠাইয়া নোকার রাখিয়া আমিরট্টকে সংবাদ দিয়াছিল।

‘আমিরট্ট সেই নোকার উপর আসিলেন। দেখিলেন, ফটর অচেতন, কিন্তু প্রাণ নির্গত হয় নাই। মৃত্তিক ক্ষত হইয়াছিল বলিয়া চেতনা বিনষ্ট হইয়াছিল। ফটরের মরিবারই অধিক সম্ভাবনা। বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। আমিরট্ট চিকিৎসা জানিতেন, রীতিমত স্ত্রীহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বকা-উল্লার প্রস্তুত সন্ধান মতে, ফটরের নোকা খুঁজিয়া বাটে আনিলেন। যখন আমিরট্ট মুন্সের হইতে যাত্রা করেন, তখন মৃতবৎ ফটরকে সেই নোকায় তুলিয়া আনিলেন।

ফটরের পরমাণু ছিল—সে চিকিৎসায় বাঁচিল। আবার পর-মাণু ছিল, মুরশিদাবাদে মুসলমান-হস্তে বাঁচিল। কিন্তু এখন সে রক্ত-বলহীন—ভেঁয়শীল—আর সে সাহস—সে দস্ত নাই।

একশ্রেণে সে প্রাণভয়ে ভাত, প্রাণভয়ে পলাইতেছিল। মস্তিষ্কের আঘাত অল্প, বুদ্ধিও কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছিল।

ফষ্টর দ্রুত নৌকা চালাইতেছিল—তথাপি ভয়, পাছে মুসলমান পশ্চাদ্ধাবিত হয়। প্রথমে সে কাশিমবাজারের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইবে মনে করিয়াছিল—তাহাতে ভয় হইল, পাছে মুসলমান গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। সুতরাং সে অতিপ্রায় ত্যাগ করিল। এস্থলে ফষ্টর যথার্থ অসুস্থমান করিয়াছিল। মুসলমানেরা অচিরে কাশিমবাজারে গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া তাহা লুণ্ঠ করিল।

ফষ্টর দ্রুতবেগে কাশিমবাজার, কলকাতা, সৈদাবাদ, রাজা-মাটি ছাড়াইয়া গেল। তথাপি ভয় যায় না। যে কোন নৌকা পশ্চাতে আইলে, মনে করে যবনের নৌকা আসিতেছে। তেঁখিল একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কোন মতেই সঙ্গ ছাড়িল না।

ফষ্টর তখন রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভ্রাস্ত বুদ্ধিতে নানা কথা মনে আসিতে লাগিল। একবার মনে করিল যে, নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া পলাই। আবার ভাবিল পলাইতে পারিব না—আমার লে বল নাই। আবার ভাবিল জলে ডুবি—আবার ভাবিল জলে ডুবিলে বাঁচিলাম কই। আবার ভাবিল যে, এই দুইটা জীলোককে জলে ফেলিয়া নৌকা হাঙ্গা করি—নৌকা আরও শীঘ্র যাইবে।

অকস্মাৎ তাহার এক কুবুদ্ধি উপস্থিত হইল। এই জীলোকদ্বিগের অল্প যবনেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। দলনী বে নবাবের বেগম, তাহা সে ভুলিয়াছিল—মনে ভাবিল, বেগমের অল্পই মুসলমানেরা ইংরেজের

নোকা আক্রমণ করিয়াছে। অতএব বেগমকে ছাড়িয়া নিলে আর কোন গোল থাকিবে না। সে স্থির করিল যে দলনীকে নামাইয়া দিবে।

দলনীকে বলিল, “ঐ একখানি ক্ষুদ্র নোকা আমাদের পাছু পাছু আসিতেছে দেখিতেছ ?”

দলনী বলিল, “দেখিতেছি।”

ক। উহা তোমাদের লোকের নোকা,—তোমাকে কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে।

একরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিল ? কিছুই না, কেবল ফটরের বিকৃত মূর্দ্ধিই ইহার কারণ,—সে রজ্জুতে সর্প দেখিল। দলনী যদি বিবেচনা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে এ কথার সন্দেহ করিত। কিন্তু যে তাহার জন্য ব্যাকুল হয়, সে তাহার নামেই মুগ্ধ হয়, আশায় অন্ধ হইয়া বিচারে পরাস্থ হয়। দলনী আশায় মুগ্ধ হইয়া সে কথায় বিশ্বাস করিল—বালি, “তবে কেন ঐ নোকায় আমাদের উঠাইয়া দাও না। তোমাকে অনেক টাকা দিব।”

ক। আমি তাহা পারিব না। উহারা আমার নোকা ধরিতে পারিলে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

দ। আমি বারণ করিব।

ক। তোমার কথা শুনিবে না। তোমাদের দেশের লোক দ্রীলোকের কথা গ্রাহ্য করে না।

দলনী তখন ব্যাকুলতা বশতঃ জ্ঞান হারাইল—ভাল বন্দ ভাবিয়া দেখিল না। যদি ইহা নিজামতের নোকা না হয় তবে কি হইবে, তাহা ভাবিল না; এ নোকা যে নিজামতের নহে,

সেকথা তাহার মনে আসিল না । ব্যাকুলতা বশতঃ আপনাকে বিপদে নিক্ষেপ করিল, বলিল, তবে আমাদের তীরে নামাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাও ।

ফটর সানন্দে সম্মত হইল । নৌকা তীরে লাগাইতে হুকুম দিল ।

কুলসম্ বলিল, আমি নামিব না । আমি নবাবের হাতে পড়িলে আমার কপালে কি আছে বলিতে পারি না । আমি সাহেবের সঙ্গে কলিকার্তায় যাইব—সেখানে আমার জানা ওনা লোক আছে ।”

দলনী বলিল, “তোমার কোন চিন্তা নাই । যদি আমি বাচি, তবে তোকেও ছাড়াইব ।”

কুলসম্ । তুমি বাচিলে ত ?

কুলসম্ কিছুতেই নামিতে রাজি হইল না । দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিল—সে কিছুতেই গুনিল না ।

ফটর কুলসম্কে বলিল, “কি জানি, যদি তোমার জন্ত নৌকা পিছু পিছু আইসে । তুমিও নাম ।”

কুলসম্ বলিল, “যদি আমাকে ছাড়, তবে আমি ঐ নৌকার উত্তিয়া, যাহাতে নৌকাওয়ালারা ভোম্বাশ সঙ্গ না ছাড়ে, তাহাই করিব ।”

ফটর ভয় পাইয়া আর কিছু বলিল না—দলনী কুলসমের অন্ত চকের অল কেন্দ্রিয়া নৌকা হইতে উঠিল । ফটর নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল । তখন সূর্যাস্তের অন্নমাত্র বিলম্ব আছে ।

ফটরের নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহির হইল । যে ক্ষুদ্র ভরসীকে নিজামতের নৌকা ভাবিয়া ফটর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিল, সে নৌকাও নিকটে আসিল । প্রতিকর্মে দলনী মনে করিতে

লাগিল যে, নোকা এইবার তাঁহাকে তুলিয়া লইবার ক্ষমতা  
ভিড়িবে : কিন্তু নোকা ভিড়িল না । তখন তাহাকে দেখিতে  
পাইয়াছে কি না এই সন্দেহে দলনী অকল উক্কোথিত করিয়া  
আন্দোলিত করিতে লাগিল । তথাপি নোকা ফিরিল না ।  
বাহিয়া বাহির হইয়া গেল । তখন বিদ্রোহমকের জ্ঞান  
দলনীর চমক হইল—এ নোকা নিজামতের কিলে সিদ্ধান্ত  
করিলাম ! অপরের নোকা হইতেও পারে ! দলনী তখন ক্ষিপ্ত  
জ্ঞান উচ্চেষ্টায় সেই নোকার নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিল ।  
“এ নোকার হইবে না” বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল ।

দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল । ফষ্টরের নোকা তখন  
দৃষ্টির অতীত হইয়াছিল—তথাপি সে কূলে কূলে দৌড়িল, তাহা  
ধরিতে পারিবে বলিয়া দলনী কূলে কূলে দৌড়িল । কিন্তু বহু-  
দূরে দৌড়িয়া নোকা ধরিতে পারিল না । পূর্বেই সন্ধ্যা হইয়া-  
ছিল—একণে অন্ধকার হইল । গঙ্গার উপরে আর কিছু দেখা  
যায় না—অন্ধকারে কেবল বর্ষার নববারি-প্রবাহের কলকল  
ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল । তখন হতাল হইয়া দলনী উন্মূলিত  
ক্ষুদ্র বৃক্ষের জায় বসিয়া পড়িল ।

কণকাল পরে দলনী, আর গঙ্গাগর্ভ মধ্যে বসিয়া কোন ফল  
নাই বিবেচনা করিয়া গাজোখান করিয়া, ধীরে ধীরে উপরে  
উঠিল । অন্ধকারে উঠিবার পথ দেখা যায় না । ছই একবার  
পড়িয়া উঠিল । উঠিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, চারিদিক্ চাহিয়া  
দেখিল । দেখিল, কোন দিকে কোন প্রাসের কোন চিহ্ন নাই—  
কেবল অনন্ত প্রান্তর, আর সেই কলনাগিনী নদী ; বহুদূর ত  
ছধাই নাই—কোন দিকে আলো দেখা যায় না—প্রায় দেখা

বার না—বৃক্ষ দেখা বার না—পথ দেখা বার না—শৃগাল কুহুর  
ভিন্ন কোন জন্তু দেখা বার না—কলনাধিনী নদী-প্রবাহে নক্ষত্র  
নাচিতেছে দেখা বার । দলনী মৃত্যু নিশ্চয় করিল ।

সেইখানে প্রান্তর মধ্যে নদীর অনতিদূরে দলনী বসিল ।  
নিকটে বিল্লী রব করিতে লাগিল—নিকটেই শৃগাল ডাকিতে  
লাগিল । রাত্রি ক্রমে গৃভীরা হইল—অন্ধকার ক্রমে ভীমতর  
হইল । রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, দলনী অহাভর পাইয়া দেখিল,  
সেই প্রান্তর মধ্যে, এক দীর্ঘাকার পুরুষ একা বিচরণ করিতেছে ।  
দীর্ঘাকৃত পুরুষ; বিনাবাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল ।

আবার সেই । •এই 'দীর্ঘাকৃত' পুরুষ শৈবলিনীকে তুলিয়া  
লইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে পর্কতারোহণ করিয়াছিল ।



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

### নৃত্য গীত ।

মুন্দের প্রশস্ত অট্টালিকা মধ্যে স্বরূপচন্দ্র জগৎ শেঠ এবং  
মাহতাব্চন্দ্র জগৎশেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায়  
নিশীথে সহস্র প্রদীপ জলিতেছিল। তথায় স্বৈতমন্দিরবিজ্ঞাস-  
শীতল মণ্ডপ মধ্যে, নর্তকীয় বস্ত্রাভরণ হইতে সেই অসংখ্য  
দীপমালোৎসর্গ প্রতিকলিত হইতেছিল। তলে জল বাধে—আর  
উজ্জলেই উজ্জল বাধে। দীপরাশি উজ্জল প্রস্তরস্তম্ভে—উজ্জল  
স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত মসনদে, উজ্জল হীরকাদি খচিত গন্ধপাত্রে,  
শেঠদিগের কণ্ঠনিলদ্বিত কুলোজ্জল মুক্তাচারে—আল নর্তকীয়  
প্রকোষ্ঠ, কণ্ঠ, কেশ এবং কর্ণের আভরণে জলিতেছিল। তাহার  
সঙ্গে মধুর গীতশব্দ উঠিয়া উজ্জল মধুরে মিশাইতেছিল। উজ্জলে  
মধুবে মিশিতেছিল! যখন নৈশ, নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়,  
তখন উজ্জলে মধুরে মিশে; যখন স্নানরীর সজল নীলেন্দীবর  
লোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জলে মধুরে  
মিশে; যখন স্বচ্ছ নীল সরোবরশারিনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীর  
দলরাজি, বালসুখ্যের চেমোজ্জল কিরণে বিভিন্ন হইতে থাকে, নীল  
জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্গিরমালার উপরে দীর্ঘ রশ্মি সকল নিপতিত  
হইয়া পদ্মপত্রের জলবিন্দুকে জালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গকুলের কল  
কণ্ঠ বাজাইয়া দিয়া, জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে যায়,

তখন উজ্জলে মধুরে মিশে ; আর যখন তোমার গৃহিণীর পাদ-  
পদ্মে, ডায়মন ক্যুটা মলী ভান্ন লুটাইতে থাকে, তখন উজ্জলে  
মধুরে মিশে । যখন সন্ধ্যাকালে, গগনমণ্ডলে, সূর্য্যোভেজ ডুবিয়া  
যাইতেছে দেখিয়া নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ  
পশ্চাৎ দৌড়ায়, তখন উজ্জলে মধুরে মিশে,—আর যখন,  
তোমার গৃহিণী কর্ণাভরণ দোলাইয়া, তিরস্কার করিতে করিতে  
তোমার পশ্চাক্ষাতি হন, তখন উজ্জলে মধুরে মিশে । যখন  
চন্দ্র কিরণ প্রদীপ্ত গঙ্গাজলে বায়ু প্রপীড়নে সফেন তরঙ্গ উৎ-  
ক্ষিপ্ত হইয়া চাঁদের আলোতে অলিতে থাকে, তখন উজ্জলে  
মধুরে মিশে,—আর যখন স্পার্কিংস্টোম্পন তরঙ্গ তুলিয়া স্ফটিক  
পাত্রে অলিতে থাকে, তখন উজ্জলে মধুরে মিশে । যখন জ্যোৎস্না-  
ময়ী রাত্রিতে দক্ষিণ বায়ু নিলে, তখন উজ্জলে মধুরে মিশে—আর  
যখন সন্দেশনয় ফলাহারের পাতে, রক্তত মুদ্রা দক্ষিণা মিলে,  
তখন উজ্জলে মধুরে মিশে । যখন প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে হর্ষোৎসূহ  
হইয়া বসন্তের কোকিল ডাকিতে থাকে, তখন উজ্জলে মধুরে  
মিশে—আর যখন প্রদীপমালার আলোকে রত্নাভরণে ভূষিত  
হইয়া, রমণী সঙ্গীত করে, তখন উজ্জলে মধুরে মিশে ।

উজ্জলে মধুরে মিশিল—কিন্তু শেঠদিগের অন্তঃকরণে তাহার  
কিছুই মিশিল না । তাঁহাদের অন্তঃকরণে মিশিল, গুরুগন্ থা ।

বান্ধালা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জলিয়া উঠিয়াছে । \*কলি-  
কাতার অহুমতি পাইবার পূর্বেই পাটনার এলিস্ সাহেব পাট-  
নার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন । প্রথমে তিনি দুর্গ অধিকার  
করেন, কিন্তু মুন্সুর হইতে মুসলমান সৈন্ত প্রেরিত হইয়া  
পাটনাস্থিত মুসলমান সৈন্তের সহিত একত্র হইয়া, পাটনা

মুনসীফর মীর কাসেমের অধিকারে লইয়া আইসে। এমিস্ প্রভৃতি পাটনাস্থিত ইংরেজেরা মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া, যুদ্ধেরে বন্দীভাবে আনীত হইলেন। এক্ষণে উভয় পক্ষে প্রকৃতভাবে যুদ্ধসজ্জা করিতেছিলেন। শেঠদিগের সহিত গুরুগন্ খাঁ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। নৃত্য গীত উপলক্ষ মাত্র—জগৎশেঠেরা বা গুরুগন্ খাঁ কেহই তাহা শুনিতে-ছিলেন না। সকলে যাহা করে, তাহারো তাহাই করিতে-ছিলেন। শুনিবার জন্য কৈ কবে সঙ্গীতের অবতারণা করায় ?

গুরুগন্ খাঁর মনস্কামনাসিদ্ধ হইল—তিনি মনে করিলেন যে উভয় পক্ষ বিবাদ করিয়া ক্ষণকাল হইলে, তিনি উভয় পক্ষকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সে অভিলାষ সিদ্ধির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সেনাগণ তাহারই বাধ্য থাকে। সেনাগণ অর্থ ভিন্ন বণীভূত হইবে না—শেঠ-কুবেয়গণ সহায় না হইলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। অতএব শেঠ-দিগের সঙ্গে পরামর্শ গুরুগন্ খাঁর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এ দিকে, কাসেম আলিগাঁও বিলক্ষণ জানিতেন যে, যে পক্ষকে এই কুবেয়গণ অসুগ্রহ করিবেন, সেই পক্ষ জয়ী হইবে। জগৎ-শেঠেরা যে মনে মনে তাহার অহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন; কেন না তিনি তাহাদিগের সঙ্গে সহ্যবহার করেন নাই। সন্দেহ বশতঃ তাহাদিগকে যুদ্ধেরে বন্দীস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। তাহারো সুযোগ পাইলেই তাহার বিপক্ষের সঙ্গে মিলিত হইবে, ইহা স্থির করিয়া তিনি শেঠদিগকে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শেঠেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল। এ পর্যন্ত তাহারো ভয়প্রযুক্ত মীর-

কালেশ্বরের প্রতিকূলে কোন আচরণ করে নাই; কিন্তু এক্ষণে অজ্ঞান রক্ষার উপায় না দেখিয়া, গুরুগন্থীর সঙ্গে মিলিল। মীরকাসেমের নিগাত উভয়ের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিনা কারণে জগৎশেষদিগের সঙ্গে গুরুগন্থী দেখা-সাক্ষাৎ করিলে, নবাব সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন বিবেচনার, জগৎশেষেরা এই উৎসবের সৃজন করিয়া, গুরুগন্থ এবং অজ্ঞান রাজামাতাবর্গকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

গুরুগন্থী নবাবের অহুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন। এবং অজ্ঞান অমাত্যগণ হইতে পূর্ণক বলিয়াছিলেন। জগৎশেষেরা যেমন সকলের নিকট আসিয়া এক একবার আলোপ করিতে ছিলেন—গুরুগন্থীর সঙ্গে সেইরূপ মাত্র—অধিকতর অবস্থিতি করিতেছিলেন না। কিন্তু কথাবাক্য অতের অশ্রাব্য শব্দে হইতেছিল। কথোপকথন এইরূপ—

গুরুগন্থী বলিতেছেন—“আপনাদের সঙ্গে আমি একটি কুঠি থলিব—আপনাবা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন?”

মাহতাব্চন্দ—কিমতলব?

গুরু। মুন্সেরের বড় কুঠি বন্ধ করিবার জন্ত।

মাহ। স্বীকৃত আছি—এরূপ একটা নূতন কারবার না আরম্ভ করিলে আমাদের আর কোন উপায় দেখি না।

গুরুগন্থী বলিলেন, “যদি আপনারা স্বীকৃত করেন, তবে টাকার আঞ্জামটা আপনাদিগের করিতে হইবে—আমি শারীরিক পরিশ্রম করিব।”

সেই সময়ে মনিরা বাই নিকটে আসিয়া সনদী খেঁয়াল গাইল—“শিখে হোঁ ছল ডালা” ইত্যাদি। মনিরা মাহতাব

হাসিয়া বলিলেন, “কাকে বলে ? বাক—আমরা রাজি  
আছি—আমাদের মূলধন হুদে আসলে বজায় থাকিলেই হইল  
—কোন দায়ে না ঠেকি ।”

এইরূপে এক দিকে, বাইজি কেদার, হাষির, ছারানট  
ইত্যাদি রাগ কাড়িতে লাগিল, আর একদিকে, গুর্গন্ থা ও  
জগৎশেঠ রূপেয়া, নোকসান, দর্শনী, প্রভৃতি ছেঁদো কথায়  
আপনাদিগের পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন । কথাবার্তা থির  
হইলে গুর্গন্ বলিতে লাগিলেন,

“একজন নূতন বণিক কুঠি খুলিতেছে, কিছু ‘গুনিয়াছেন ?”

মাহ । না—দেশী না বিলাতী ?

গুর্ । দেশী ।

মাহ । কোথায় ?

গুর্ । মুন্সের হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সকল স্থানে ।  
যেখানে পাহাড়, যেখানে জঙ্গল, যেখানে মাঠ, সেইখানে  
তাহার কুঠি বসিতেছে ?

মাহ । ধনী কেমন ?

গুর্ । এখনও বড় ভারী ধনী নয়—কিন্তু কি হয় বলা  
যায় না ।

মাহ । কার সঙ্গে তাহার লেনদেন ?

গুর্ । মুন্সেরের বড় কুঠির সঙ্গে ।

মাহ । হিন্দু না মুসলমান ?

গুর্ । হিন্দু ।

মাহ । নাম কি ?

গুর্ । প্রতাপ রায় ।

মাহ । বাড়ী কোথায় ?

গুর । মুরশিদাবাদের নিকট ।

মাহ । নাম শুনিয়াছি—সে সামান্ত লোক ।

গুর । অতি ভয়ানক লোক ।

মাহ । কেন সে চঠাৎ এ প্রকার করিতেছে ?

গুর । কলিকাতার বড় কুঠির উপর রাগ ।

মাহ । তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে—সে কিসের বশ ?

গুর । কেন সে এ কার্যে প্রবৃত্ত, তাহা না জানিলে বলা যায় না । যদি অর্থলোভে বেতনভোগী হইয়া কার্য আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কিনিতে কতক্ষণ ? অমীজনা তালুক মূল্যও দিতে পারি । কিন্তু যদি ভিতরে আর কিছু থাকে ?

মাহ । আর কি থাকিতে পারে ? কিসে প্রতাপ রায় এত মাতিল ?

বাইজি । সে সময়ে গাইতেছিল, “গোরে গোরে মুখ পরা,  
বেশর শোহে ।”

মাহতাব্ন্দ বলিলেন, “তাই কি ? কার গোরা মুখ ?”

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

দলনী কি করিল ।

মহাকায় পুরুষ, নিঃশব্দে দলনীর পাশে আসিয়া বসিল ।

দলনী কঁাদিতেছিল, "ভয় পাইয়া রোদন সম্বরণ করিল, নিম্পন্দ হইয়া রহিল । আগন্তুকও নিঃশব্দে রহিল ।

যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অজ্ঞাত দলনীর আর এক সর্বনাশ উপস্থিত হইতেছিল ।

মহম্মদ তকির প্রতি ক্ষুণ্ণ আদেশ ছিল যে, ইংরেজদিগের নোকা হইতে 'দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুদ্বরে পাঠাইবে । মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা বন্দী বা হত হইলে, বেগম কাজে কাজেই তাঁহার হস্তগত হইবেন । সুতরাং অনুচরগণকে বেগম সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই । পরে যখন, মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নোকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ উপস্থিত । তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব কষ্ট হইয়া, কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা বলা যায় না । এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তকি সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন । লোক-পরম্পরায় তখন জনা বাইতেছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজেরা মীরজাফরকে কারাবদ্ধ করিয়া

পুনর্বার মসনদে বসাইবেন । যদি ইংরেজেরা যুদ্ধজয়ী হইলেন, তবে মীরকাসেম এ প্রবন্ধনা শেষে জানিতে পারিলেও কোন কতি হইবে না । আপাততঃ বাচিতে পারিলেই অনেক লাভ । পরে যদি মীরকাসেম জয়ী হইলেন, তবে তিনি বাহাতে প্রকৃত ঘটনা কখনও না জানিতে পারেন, এমন উপায় করা যাইতে পারে । আপাততঃ কোন কঠিন আজ্ঞা না আসে । এইরূপ ছুরতিসন্ধি করিয়া তকি এই গায়ে নবাবের সমীপে মিথ্যাকথা-পরিপূর্ণ এক আরজি পাঠাইতেছিলেন ।

মহম্মদ তকি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিরটের নোকার পাওয়া গিয়াছে । তকি তাহাকে আনিয়া যথা সম্মান-পূর্ব্বক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন । কিন্তু বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাহাকে ছাড়ুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না । ইংরেজদিগের সঙ্গে খানসামা, নাবিক, সিপাহী প্রভৃতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের সকলের প্রমুখ্যৎ গুলিয়াছেন যে, বেগম আমিরটের উপপত্নী স্বরূপ নোকার বাস করিতেন । উভয়ে এক পথায় শয়ন করিতেন । বেগম স্বয়ং এ সকল কথা স্বীকার করিতেছেন । তিনি এক্ষণে প্রুইধর্ম্মানুলম্বন করিয়াছেন । তিনি মুন্সেরে যাইতে অসম্মত । বলেন, “আমাকে ছাড়িয়া দাও । আমি কলিকাতায় গিয়া আমিরট সাহেবের স্নহদগণের নিকট বাস করিব । যদি না ছাড়িয়া দাও, তবে আমি পলাইয়া যাইব । যদি মুন্সেরে পাঠাও, তবে আত্মহত্যা করিব ।” এমন অবস্থায় তাহাকে মুন্সেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন, কি ছাড়িয়া দিবেন, তাহা নিয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন । আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন । তকি এই মর্মে পত্র লিখিলেন ।



অখারোহী দূত সেই রাতেই এই পত্র লইয়া মুন্সেরে যাত্রা করিল ।

কেহ কেহ বলে, দূরবর্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে পারে । এ কথা যে, সত্য এমন নহে ; কিন্তু যে মুহূর্তে মুরশিদাবাদ হইতে অখারোহী দূত, দলনীবিষয়ক পত্র লইয়া মুন্সেরে যাত্রা করিল, সেই মুহূর্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল । সেই মুহূর্তে তাঁহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ, প্রথম কথা কহিল । তাঁহার কণ্ঠস্থ হউক, অমঙ্গল ঘটনায় হউক বাহাতে হউক, সেই মুহূর্তে দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল ।

‘পার্শ্ববর্তী পুরুষ বলিল,

“তোমার চিনি । তুমি দলনী বেগম ।”

দলনী শিহরিল ।

পার্শ্বস্থ পুরুষ পুনরপি কহিল,

“জানি, তুমি এই বিজ্ঞান স্থানে হুজুয়া কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ ।”

দলনীর চক্ষের প্রবাহ আকর ছুটিল । আগন্তুক কহিল,  
“এক্ষণে তুমি কোথা বাইবে ?”

সহসা দলনীর ভয় দূর হইয়াছিল । ভয় বিনাশের দলনী বিশেষ কারণ পাইয়াছিল । দলনী কাদিল । প্রসন্নকণ্ঠ প্রশ্ন পুনরুক্ত করিলেন ! দলনী বলিল,

“বাইব কোথায় ? আমার বাইবার স্থান নাই । এক বাইবার স্থান আছে—কিন্তু সে অনেক দূর । কে আমাকে সেখানে সঙ্গে লইয়া বাইবে ?”

• আগন্তুক বললেন, “তুমি নবাবের নিকটে বাইবার বাসনা পূরিষ্ঠা কর ।”

দলনী উৎকণ্ঠিতা, বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, “কেন ?”

“অমঙ্গল ঘটবে ।”

দলনী শিহরিলা, বলিল, “বটুক । সেই বৈ আর আমার স্থান নাই । অতঃপর মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল ।”

“তবে উঠ । আমি তোমাকে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি । মহম্মদ তকি তোমাকে মুন্সেরে পাঠাইয়া দিবেন । কিন্তু আমার কথা শুন । এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে । নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাইবার উত্তোগ করিতেছেন । তুমি সেখানে যাইও না ।”

“আমার কপালে যাই থাকুক, আমি বাইব ।”

“তোমার কপালে মুন্সের দর্শন নাই ।”

দলনী চিস্তিত হইল । বলিল, “ভবিষ্য কে জানে ? চলুন, আপনার সঙ্গে আমি মুরশিদাবাদ বাইব । যতক্ষণ শ্রাণ আছে, নবাবকে হেদবিবার আশা ছাড়িব না ।”

আগন্তুক বলিলেন, “তাছাড়া জানি । আইস ।”

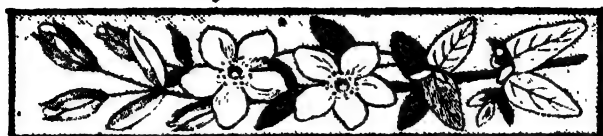
হুইজনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদে চলিল । দলনী-পতঙ্গ বহিমুখবিসিক্ত হইল ।



যাঁচ খণ্ড ।







ষষ্ঠ খণ্ড ।

— ০০ —

সিদ্ধি ।

— ০০ —

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

পূর্বকথা ।

পূর্বকথা দাড়া বলি নাই, একপে সংক্ষেপে বলিব। চন্দ্র-  
শেখরই যে পূর্বকথিত ব্রহ্মচারী, তাহা জানা গিয়াছে।

যে দিন আমিয়ট, ফণের সহিত, মুন্সের হইতে বাঁজা করি-  
লেন, সেই দিন সন্ধান করিতে করিতে রমানন্দ নামী জানিলেন  
যে, ফটর ও দলনীবগম প্রভৃতি একত্রে আমিয়টের সঙ্গে  
গিয়াছেন। গঙ্গাতীরে চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাকে  
এ সংবাদ অবগত করাইলেন, বলিলেন,—

“এখানে তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন কি—কিছুই না। তুমি এখনে প্রত্যাগমন কর। শৈবলিনীকে আমি কানী পাঠাইব। তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ, অস্ত্র হইতে তাহার কাৰ্য্য কর। এই যবনকল্পা ধর্ম্মিষ্ঠা, এক্ষণে বিপদে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহার পশ্চাদ্‌অনুসরণ কর; যখনই পারিবে, ইহার উদ্ধারের উপায় করিও। প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপকারী, তোমার জন্তই এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত; তাহাকে এ সময়ে ত্যাগ করিতে পারিবে না। তাহাদের অনুসরণ কর।” চন্দ্রশেখর নবাবের নিকট সংবাদ দিতে চাহিলেন, রমানন্দ স্বামী নিষেধ করিলেন, বলিলেন, আমি সেখানে সংবাদ দেওয়াইব। চন্দ্রশেখর গুরুদ্বন্দ্বের আদেশে, অগত্যা, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া আমিরটের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামীও সেই ভাবিধি শৈবলিনীকে কানী পাঠাইবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শিষ্যের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অকস্মাৎ জানিলেন যে, শৈবলিনী পৃথক নৌকা লইয়া ইংরেজের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রমানন্দ স্বামী বিধম সঙ্কটে পড়িলেন। এ পাণ্ডিত্য কাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল, ফষ্টেরের না চন্দ্রশেখরের? রমানন্দ স্বামী, মনে মনে ভাবিলেন, “বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্ত আবার আমাকে সাংসারিক ব্যাঘাতের নিপত্তি হইতে হইল।” এই ভাবিয়া তিনিও সেই পথে চলিলেন।

রমানন্দ স্বামী, তিরকাল পদব্রজে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন,—উৎকৃষ্ট পদিকারক। তিনি তটপথে, পদব্রজে, শীঘ্রই শৈবলিনীকে পশ্চাৎ করিয়া আসিলেন, বিশেষ তিনি আহাৰ নিদ্রার বশীভূত নহেন, অভ্যাসগুণে সে সকলকে বশীভূত

করিয়াছিলেন। ক্রমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে ধরিলেন। চন্দ্রশেখর তাঁরে রমানন্দ স্বামীকে দেখিরা, তথায় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “একবার, নবদ্বীপে, অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ত বঙ্গদেশে যাইব, অভিলষ্য করিয়াছি ; চল তোমার সঙ্গে যাই।” এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরের নৌকায় উঠিলেন।

ইংরেজের বহর দেখিয়া তাঁহারা কুদ্র তরলী নিভূতে রাখিয়া তাঁরে উঠিলেন। দেখিলেন শৈবলিনীর নৌকা আসিয়াও, নিভূতে রহিল ; তাঁহারা দুইজন তঁারে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিরা সকল দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রতাপ শৈবলিনী সীতার দিয়া পলাইল। দেখিলেন তাহারা নৌকায় উঠিয়া পলাইল। তখন তাঁহারাও নৌকায় উঠিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ দৃষ্টি হটলেন। তাহারা নৌকা লাগাইল, দেখিয়া তাঁহারাও কিছু দূরে নৌকা লাগাইলেন। রমানন্দ স্বামী অনন্তবুদ্ধিশালী,—চন্দ্রশেখরকে বলিলেন,

“সাতার দিবার সময় প্রতাপ ও শৈবলিনীতে কি কথোপকথন হইতেছিল, কিছু শুনিতে পাইয়াছিলে ?”

চ। না।

র। তবে, অন্য রাত্রে নিদ্রা যাইও না। উহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

উভয়ে জাগিরা রহিলেন। দেখিলেন, শেষ রাত্রে শৈবলিনী নৌকা হইতে উঠিয়া গেল। ক্রমে তীরবৃত্তদ্বারা প্রবেশ করিয়া অদৃশ হইল। প্রত্যাহার, তথাপি কিয়ল না। তখন রমানন্দ



‘স্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “কিছু বুদ্ধিতে পারিতেছি না, ইহার মনে কি আছে । চল, উহার অমূল্যস্বরূপ করি ।”

তখন উভয়ে সতর্কভাবে শৈবলিনীর অমূল্যস্বরূপ করিলেন । সন্ধ্যার পর মেঘাড়খর দেখিয়া রমানন্দ স্বামী বলিলেন,

“তোমার বাহুতে বল কত ?”

চন্দ্রশেখর, হাসিয়া, একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর এক হস্তে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন ।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “উত্তম । শৈবলিনীর নিকটে গিয়া অন্তরালে বসিয়া থাক, শৈবলিনী আগতপ্রায় রাত্যায় সাহায্য না পাইলে জীহত্য হইবে । নিকটে এক গুহা আছে । আমি তাহার পথ চিনি । আমি যখন বলিব, তখন তুমি শৈবলিনীকে ফ্রোড়ে লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিও ।”

চু । এখনই ঘোরতর অন্ধকার হইবে, পথ দেখিব কি প্রকারে ?

র । আমি নিকটেই থাকিব । আমার এই দণ্ডাগ্রভাগ, তোমার মুষ্টিমধ্যে দিব । অপর ভাগ আমার হস্তে থাকিবে ।

শৈবলিনীকে গুহায় রাখিয়া, চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিলে, রমানন্দ স্বামী মনে মনে ভাবিলেন, “আমি এতকাল সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, সর্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা ! এই বালিকার মনের কথা বুদ্ধিতে পারিলাম না ! এ সমুদ্রের কি তল নাই ?” এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “নিকটে এক পার্শ্বত্য মঠ আছে, সেইখানে অস্ত্র গিয়া বিশ্রাম কর । শৈবলিনীর পক্ষে যৎকর্তব্য সন্নিবিষ্ট হইলে তুমি পুনরপি যবনীর অমূল্যস্বরূপ করিবে ! মনে জানিও, পরহিত ভিন্ন

তোমার ব্রত নাই । শৈবলিনীর অল্প চিন্তা করিও না, আমি এখানে রহিলাম । কিন্তু তুমি আমার অমুখতি ব্যতীত শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না । তুমি যদি আমার মতে কার্য্য কর, তবে শৈবলিনীর পরমোপকার হইতে পারে ।”

এই কথার পর চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন । রমানন্দ স্বামী তাহার পর, অন্ধকারে, অলক্ষ্যে, গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

তাহার পর বাহা ঘটিল, পাঠক সকলই জানেন ।

উন্মাদগ্রস্ত শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর সেই মঠে রমানন্দস্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন । কাঁদিয়া বলিলেন, “গুরুদেব ! এ কি করিলে ?”

রমানন্দ স্বামী, শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঈর্ষ হাস্ত করিয়া কহিলেন,

“ভালই হইয়াছে । চিন্তা করিও না । তুমি এইখানে ছই এক দিন বিশ্রাম কর । পরে ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও । যে গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইহাকে রাখিও । যাহারা ইহার গঙ্গী ছিলেন, তাহাদিগকে সর্বদা ইহার কাছে থাকিতে অমুরোধ করিও । • প্রতাপকেও সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিও । আমি পক্ষাৎ যাইতেছি ।”

গুরুর আদেশ মত চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

হকুম ।

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মীরকাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল । মীরকাসেম প্রথমেই 'কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন । তাহার পর গুরগন্ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল । নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্বাপন হইল । নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল । বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন । অত্যাচার সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন । এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সংবাদ পৌঁছিল । অলস্তু অগ্নিতে স্নাতাহতি পড়িল । ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজ্য-লক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী ? আর সহিল না । মীরকাসেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, “দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই । তাহাকে সেইখানে বিবপান করাইয়া বধ করিও ।”

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকটে গেল । মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইলেন । ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “এ কি খাঁ সাহেব ? আমাকে বেইজ্ঞৎ করিতেছেন কেন ?”

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, “কপাল ! নবাব আপনার প্রতি অগ্রসর ।”

দলনী হাসিয়া বলিলেন, “আপনাকে কে বলিল ?”

মহম্মদ তকি বলিলেন, “না বিস্বাস করেন, পরওয়ানা দেখুন ।”

দ। তবে আপনি পরওয়ানা পড়িতে পারেন নাই ।

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের সহিমোহরের পরওয়ানা পড়িতে দিলেন । দলনী পরওয়ানা পড়িয়া, হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন । বলিলেন, “এ জাতি । আমায় সঙ্গে এ রহস্য কেন ? মরিবে সেই জন্ত ?”

মহ। আপনি ভীতা হইবেন না । আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি ।

দ। ও হো ! তোমার কিছু মংলব আছে ! তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ ?

মহ। তবে শুনুন । আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি অফিসের নোকায় তাহার উপদ্রবীকরণ ছিলেন, সেই জন্ত এই হকুম আসিয়াছে ।

তিনি দলনীকে কুণ্ঠিত করিলেন । স্থিরবারিশাখিনী ললাটগঙ্গার তরঙ্গ উঠিল—রুদ্ধহৃতে চিন্তা-গুণ দিল—মহম্মদ তকি মনে মনে প্রমাদ গণিল । দলনী বলিলেন, “কেন লিখিয়াছিলে ?” মহম্মদ তকি আত্মপূর্বক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল ।

তখন দলনী বলিলেন, “দেখি, পরওয়ানা আবার দেখি ।”

মহম্মদ তকি পরওয়ানা আবার দলনীর হস্তে দিল । দলনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন, বার্থ বটে । জাল নহে । “কই বিষ ?”

“কই বিব ?” তুমিরা মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল,  
“বিব কেন ?”

দ। পরওয়ানার কি হুকুম আছে ?

মহ। আপনারে বিবপান করাইতে।

দ। তবে কই বিব ?

মহ। আপনি বিবপান করিবেন না কি ?

দ। আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না ?

মহম্মদ তকি মর্শ্বের ভিতর লজ্জার মরিয়া গেল। বলিল,  
“যাহা হইরাছে, হইরাছে। আপনাকে বিবপান করিতে হইবে  
না।” আমি ইহার উপায় করিব।”

দলনীর চক্ষু হইতে জ্বালা অগ্নিকুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই  
ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন,

“যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে  
তোমার অপেক্ষাও অধম—বিব আন।”

মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিল। “সুন্দরী—নবীনা—  
সবে মাত্র বোবনবর্ষার রূপের নদী গুরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে  
অক-মুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত বর্ষার একত্র মিশিয়াছে।  
বাকে দেখিতেছি—সে স্থখে ফাটিতেছে—কিন্তু আমার দেখিরা  
কত দুঃখ ! জগদীশ্বর ! দুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন ? এই  
বৈ কাতরা বালিকা—বাত্যাভাঙিত, প্রক্ষুণ্ণিত কুসুম—  
ভরজোৎস্নাভিতা, প্রমোদ নৌকা—ইহাকে লইয়া কি করিব—  
কোথার রাখিব ? সন্নতাব আসিয়া তকির কানে কানে বলিল,—  
“হৃদয় মধ্যে।”

তকি বলিল, “তন সুলতানী—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না ।”

তনিয়া দলনী—লিখিত লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন ।

মহম্মদ তকির বিষ দান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি, অর্কদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে, ধীরে, ধীরে, ফিরিয়া গেল ।

তখন দলনী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন—  
“ও রাজ রাজেশ্বর ! শাহান্‌শাহ ! বাদশাহের বাদশাহ ! এ গরিব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ ! বিষ খাইব ? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না ! তোমার আগরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন বুগ করিয়াছ—তখন আমি বিষপান করিয়াছি । ইহার অপেক্ষা বিষ কি অধিক যন্ত্রণা ! ইহ রাজাধিরাজ—জগতের আলো—অনাথার তরঙ্গা—পৃথিবীপতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দয়ার সাগর—কোথার রহিলে ? আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু তুমি দাড়াইয়া দেখিলে না—এই আমার ছঃখ ।”

করিমন্ নামে একজন পরিচারিকা দলনী বেগমের পরিচর্য্যার নিযুক্ত ছিল । তাহাকে ডাকিয়া, দলনী আপনায় অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিলেন । বলিলেন, “লুকাইয়া হকিমের নিকট হইতে আমাকে এমন ঔষধ আনিয়া দাও, যেন আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙ্গে । মূল্য এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও । বাকি বাহা থাকে তুমি লইও ।”

করিমন্, দলনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া ব্যুজিল । প্রথমে সৈ  
সম্মত হইল না—দলনী পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন ।  
শেষে মূৰ্খ লুক্কীলোক, অধিক অর্থের লোভে, স্বীকৃত হইল ।

হকিম ঔষধ দিল । মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া  
গোপনে সংবাদ দিল,—“করিমন্ বাঁধি আক্ এই মাত্র হকিম  
মেবজা হবীবের নিকট হইতে বিব ক্রয় করিয়া আনিরাছে ।”

মহম্মদ তকি করিমন্কে ধরিলেন । করিমন্ স্বীকার করিল ।  
বলিল, “বিব দলনী বেগমকে দিয়াছি ।”

মহম্মদ তকি তুনিয়াই দলনীর নিকট আসিলেন । দেখিলেন,  
দলনী আসনে উক্ৰমুখে, উক্ৰদৃষ্টিতে, যুক্তকরে বসিয়া আছে—  
বিস্ফারিত পদ্মপদ্মশ চক্ষু হইতে জলধারার পর জলধারা গণ্ড  
বহিয়া বস্ত্রে আসিয়া পড়িতেছে—সম্মুখে শূত্র পাত্র পড়িয়া  
আছে—দলনী বিবপান করিয়াছে ।

মহম্মদ তকি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কিসের পাত্র পড়িয়া  
আছে ?”

দলনী বলিলেন, “ওঁ বিব । আমি তোমার মণ্ড নিমকহারাম  
নহি—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি । তোমার উচিত—  
অবশিষ্ট পান করিয়া আমার সঙ্গে আইস ।”

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল । দলনী ধীরে,  
ধীরে, শয়ন করিল । চক্ষু ব্যুজিল । সব অককার হইল ।  
দলনী চলিয়া গেল ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

### সন্ধ্যাট ও বরাট ।

মীর কাসেমের সেনা কাটোরার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভাঙ্গা ঈশান গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার জাঙ্গিল—আবার ববনসেনা, ইংরেজের বাহুবলে, বায়ুর নিকট ধূলিরাশির স্তায় তাড়িত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্তগণ আসিয়া টুদরনালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতুঃপার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া ববনেরা ইংরেজ সৈন্তের গতিরোধ করিতেছিলেন।

মীর কাসেম বরং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে, সৈয়দ আমীর হোসেন, একদা জানাইল যে, একজন বন্দী তাহার দর্শনার্থ কিশর কাতর। তাহার কোন বিশেষ নিবেদন আছে—হজুরে নহিলে তাহা প্রকাশ করিবে না।

মীর কাসেম লিজাগি করিলেন,

“সে কে?”

আমীর হোসেন বলিলেন, “একজন ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ওয়ারন্ হাউস সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে বাস্তবিক বন্দী নহে। যুদ্ধের পূর্বের পত্র বলিয়া অধীন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অপরাধ হইয়া থাকে, গোলাম হাজির আছে।” এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র পড়িয়া নবাবকে ওনাইলেন।



ওয়ারন্ হেষ্টিংস্ লিখিয়াছিলেন, “এ জীলোক কে, তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল যে, কসিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদিগের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের আতি জীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। তাল মন্ড কিছু জানি না।”

নবাব পত্র শুনিয়া, জীলোককে সম্মুখে আনিতে অমুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ জীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিবেন—নবাব দেখিলেন—কুলসন্।

নবাব কষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, “তুই কি চাহিস্ বাদী—মরিষি—?”

কুলসন্ নবাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল—“নবাব! তোমার বেগম কোথায়! দলনী বিবি কোথায়! আমীর-হোসেন কুলসন্মের বাক্যপ্রণালী দেখিয়া ভীত হইল—এবং নবাবকে অভিবাদন করিয়া সরিয়া গেল।”

মীর কাসেম বলিলেন, “যেখানে সেই পাণিষ্ঠা, তুমিও সেই খানে গীষ ঘাইবে।”

কুলসন্ বলিল, “আমিও, আপনিও। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।” পথে শুনিলাম লোকে রটাইতেছে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছে। সত্য কি?”

নবাব। আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই তাহার হৃৎকেন্দ্রের সহায়—তুই কুকুরের দ্বারা ভুক্ত হইবি—

কুলসন্ মাছড়াইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল—এবং

বাহ্য মুখে আসিল, তাহা বলিয়া নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। তনিয়া চারি দিক্ হইতে সৈনিক, ওরমাহ, ভৃত্য, রক্ষক প্রভৃতি আসিয়া পড়িল—একজন কুলসমের চুল ধরিয়া তুলিতে গেল। নবাব নিবেদন করিলেন—তিনি বিস্মিত হইয়া ছিলেন। সে সরিয়া গেল। তখন কুলসম বলিতে লাগিল, “আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এক অপূৰ্ণ কাহিনী বলিব, শুুন।” আমার একগুহে বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না। এই সময় শুুন।”

“শুুন, সুবে বাঙ্গাল বেহারের, মীর কাসেম নামে, এক সুৰ্গ নবাব আছে। দলনী নামে, তাহার বেগম ছিল। সে নবাবের সেনাপতি গুৰ্গন্ খাঁর ভগিনী।”

তনিয়া কেহ আর কুলসমের উপর আক্রমণ করিল না—সকলেই পতঙ্গের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল—সকলেরই কোতূহল বাড়িতে লাগিল। নবাবও কিছুই বলিলেন না—কুলসম বলিতে লাগিল,

“গুৰ্গন্ খাঁ ও দৌলত উল্লাহ ইঙ্গাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবকাষেবণে বাঙ্গালার আসে। দলনী যখন মীর কাসেমের গৃহে বাদীস্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।”

কুলসম তাহার পরে, যে রাজ্যে তাহারা দুই জনে গুৰ্গন্ খাঁর ভবনে গমন করে তদ্ভিত্তান্ত সবিত্তারে বলিল। গুৰ্গন্ খাঁর সঙ্গে যে সকল কথা বার্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে তনিয়া ছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে, প্রত্য্যকর্তন, আর নিবেদন,

‘ব্রহ্মচারীর সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি, ইংরেজগণকৃত আক্রমণ এবং শৈবলিনীভ্রমে দলনীয়ে হরণ, নৌকার কারাবাস, আমিয়ট প্রভৃতির মৃত্যু, ফটেরের সহিত তাঁহারিগের পলায়ন, শেষে দলনকে গঙ্গাতীরে ফটেরকৃত পরিত্যাগ, এ সকল বলিয়া শেষে বলিতে লাগিল,

“আমার স্বপ্নে সেই সময় সন্নতান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব? আমি সেই পাণিষ্ঠ ফিরিন্দীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—মনে করিয়াছিলাম—সে কথা যাউক । মনে করিয়াছিলাম, নিজামতের নোকা পশ্চাৎ আসিতেছে—বেগমকে তুলিয়া লইবে—নহিলে আমি তাঁহাকে ছাড়িব কেন? কিন্তু তাহার যোগ্য শাস্তি আমি পাইরাছি—বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফটেরকে সাধিয়াছি যে, আমাকেও নামাইয়া দাও—সে নামাইয়া দেয় নাই । কলিকাতার গিয়া বাহাকে দেখিয়াছি—তাহাকেই সাধিয়াছি যে, আমাকে পাঠাইয়া দাও—কেহ কিছু বলে নাই । শুনিলাম হেষ্টিং সাহেব বড় দয়ালু—তাঁহার কাছে কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিলাম—তাঁহারই কৃপায় আসিয়াছি । এখন তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর—আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই ।”

এই বলিয়া কুলসমু কাদিতে লাগিল ।

বহুল্য সিংহাসনে, শত শত রশ্মি-প্রতিঘাতী রক্তরাশির উপরে বসিয়া, বাঙ্গালার নবাব,—অধোবদনে । এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড, তাঁহার হস্ত হইতে ত্যাগিত হইয়া পড়িতেছে—বহু বয়েও ত রহিল না । কিন্তু যে অজ্ঞের রাজ্য, বিনা যত্নে থাকিত

—সে কোথায় গেল! তিনি কুহুম ভ্যাংগ করিয়া কণ্টকে বন্ধ করিয়াছেন—কুলসম্ সত্যই বলিয়াছে—বান্দালার নবাব মূর্থ!

নবাব ওমরাহদিগকে সুবোধন করিয়া বলিলেন, “তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাদী বাহা বলিল, তাহা সত্য—বান্দালার নবাব মূর্থ। তোমরা পার হুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে জীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ককিরি গ্রহণ করিব”—বলিতে বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর, প্রবাহমধ্যে রোপিত বংশধরের জায় কাপিতেছিল—চক্ষের জল সংবরণ করিয়া মীর কাসেম বলিতে লাগিলেন, “তুন বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সেরাজ্জ-উল্লোহার জায়, ইংরেজ বা তাহাদের অহুচর মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনির কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আঞ্জা পালন কর—আমি সেই তুকি থাকে একবার দেখিব—

আলিহিএরাতিম খাঁ?”

হিব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন। নবাব বলিলেন, “তোমার জায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তুকি থাকে আমার কাছে লইয়া আইস।”

হিব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া, তাম্বুর বাহিরে গিয়া অখা-রোহণ করিলেন।

নবাব তখন বলিলেন, “আর কেহ আমার উপকার করিবে?”

সকলই যোড় হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন, “কেহ সেই কষ্টরক্বে আনিতে পার?”

“আমীর হোসেন বলিলেন, “সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে কলিকাতায় চলিলাম।”

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, “আর সেই শৈবলিনী কে ? তাহাকে কেহ আনিতে পারিবে ?”

মহম্মদ ইরফান্ যুক্ত করে নিবেদন করিল, “অবশ্য এতদিন সে দেশে আসিয়া থাকিবে, আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।” এই বলিয়া মহম্মদ ইরফান্ বিদায় হইল।

তাহার পরে নবাব বলিলেন, “যে ব্রহ্মচারী মুন্সেফের বেগমকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, তাহার কেহ সন্ধান করিতে পার ?”

মহম্মদ ইরফান্ বলিল, “হকুম হইলে শৈবলিনীর সন্ধানের পর ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে মুন্সেফ যাইতে ‘পারি।’”

শেষ কাসেম আলি বলিলেন “গুরুগ্ৰন্থ খাঁ কত দূর ?”

অমাত্যবর্গ বলিলেন, “তিনি ফোজ লইয়া উদয়-নালায় আসিতেছেন শুনিয়াছি—কিন্তু এখনও পৌছেন নাই।” নবাব, যুহু যুহু বলিতে লাগিলেন, “ফোজ ! ফোজ ! ক্রাহার ফোজ !”

এক জন কে চুপি চুপি বলিলেন, “তাঁরা !”

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরকখচিত উষ্ণীয় দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে ছুঁইয়া করিলেন।—তখন নবাব ভূমিতে অবলুপ্তিত হইয়া ‘দলনো ! দলনো !’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন !

এসংসারে নবাধি এইরূপ ।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### জন্ম স্ট্যান্ডার্ট ।

পূর্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কুলসমের সঙ্গে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাত্তেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুলসম্ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া, ফষ্টরের কার্য্য সকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

ইতিসাসে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কশ্মীর লোক কৰ্ত্তবানুরোধে অনেক সময়ে পরপীড়ক হইয়া উঠে। বাহার উপর রাজ্য রক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং জায়গর হইলেও রাজ্য রক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে ছই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে সে অত্যাচার কৰ্ত্তব্য। বস্তুতঃ বাহার ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের জায় সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে সক্ষম, তাঁহারা যে দয়ালু এবং জায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। বাহার প্রকৃতিতে দয়া এবং জায়গরতা নাই—তাঁহার দ্বারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না—কেন না তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—কুদ্র। এ সকল কুদ্র-চেতার কাজ নহে।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ দয়ালু ও জায়নিষ্ঠ ছিলেন। তখন তিনি গবর্নর হন নাই। কুলসম্কে বিনয় করিয়া তিনি ফষ্টরের অমুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, ফষ্টর পীড়িত। প্রথমে

তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। ফটর উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসায় দীর্ঘই আরোগ্যলাভ করিল।

তাঁহার পরে, তাঁহার অপরাধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীত হইয়া, ফটর তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল। ওয়া-রেন্ হেষ্টিংস্ কোম্পিলে প্রস্তাপ উপস্থিত করিয়া ফটরকে পদচ্যুত করিলেন। হেষ্টিংসের ইচ্ছা ছিল যে, ফটরকে বিচারালয়ে উপস্থিত করেন; কিন্তু সাক্ষীদিগের কোন সন্ধান নাই, এবং ফটরও নিজকার্যের অনেক ফলভোগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাঁহাতে বিরত হইলেন।

ফটর তাঁহা বুঝিল না। ফটর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়। সে মনে করিল, তাঁহার লঘুপাপে গুরুনগ্ন হইয়াছে। সে ক্ষুদ্রাশয়, অপরাধী ভৃত্যদিগের স্বভাবভিঙ্গারে পূর্ব প্রভুদিগের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইল। তাঁহাদিগের বৈরিতাসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ডাইস্ সম্বর নামে একজন সুইস্ বা জার্মান মীর কাসেমের সেনাদলमध्ये সৈনিক কার্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমর নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয়-নালায় যখন-শিবিরে সমর সৈন্ত লইয়া উপস্থিত ছিল। ফটর উদয়-নালায় তাঁহার নিকট আসিল। প্রথমে কোশলে সমরর নিকট দূত প্রেরণ করিল। সমর মনে ভাবিল, ইহার দ্বারা ইংরেজদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমর ফটরকে গ্রহণ করিল। ফটর আপন নাম গোপন করিয়া, জন্ ট্যাক্কার্ট বলিয়া আপনায় পরিচয় দিয়া সমরর শিবিরে প্রবেশ করিল। যখন আদীর হোসেন, ফটরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তখন লরেন্স, ফটর সমরর তাহুতে।

আমীর হোসেন, কুল্‌সম্‌কে বখাযোগ্য স্থানে রাখিয়া, ফষ্টরের অমুসন্ধানে নির্গত হইলেন। অমুচরবর্ণের নিকট শুনিলেন যে, এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, একজন ইংরেজ আগিয়া মুসলমান সৈন্তভূক্ত হইয়াছে। সে সমরুর শিবিরে আছে। আমির হোসেন সমরুর শিবিরে গেলেন।

। যখন আমির হোসেন সমরুর তাঘুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফষ্টর একত্রে কথাবার্তা কহিতেছিলেন। আমীর হোসেন আসন গ্রহণ করিলে সমরু অন্ ট্যাল্‌কার্ট বলিয়া তাহার নিকট ফষ্টরের পরিচয় দিলেন। আমীর হোসেন ট্যাল কাটের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমীর হোসেন, অজ্ঞাত কথার পর ট্যাল্‌কার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লরেন্স্‌ ফষ্টর নামক একজন ইংরেজকে আপনি চিনেন ?”

ফষ্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মুক্তিকাপানে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃতকণ্ঠে কহিল,

“লরেন্স্‌ ফষ্টর ? কই—না।”

আমীর হোসেন, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কখনও তাহার নাম শুনিয়াছেন ?”

ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল—“নাম—লরেন্স্‌ ফষ্টর হাঁ—কই ? না।”

আমীর হোসেন আর কিছু বলিলেন না, অজ্ঞাত কথা কহিতে গিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ট্যাল্‌কার্ট আর ভুল করিয়া কথা কহিতেছে না। হুই এক বার উঠিয়া বাইবার উপক্রম করিল। আমীর হোসেন অল্পরোধ করিয়া তাহাকে বসাইলেন। আমীর



হোসেনের মনে মনে হইতেছিল যে, এ ফষ্টরের কথা জানে, কিন্তু বলিতেছে না ।

ফষ্টর কিয়ৎকাল পরে আপনার টুপি লইয়া মাথায় দিয়া বসিল । আমীর হোসেন জানিতেন যে, এটি ইংরেজদিগের নিয়মবহির্ভূত কাজ । আরও, যখন ফষ্টর টুপি মাথায় দিতে যায়, তখন তাহার শিরস্থ কেশশূন্য আঘাত-চিহ্নের উপর দৃষ্টি পড়িল । ষ্ট্যান্কার্ট কি আঘাত চিহ্ন ঢাকিবার জন্য টুপি মাথায় দিল !

আমীর হোসেন বিদায় চাইলেন । আপন শিবিরে আসিয়া কুল্‌সম্কে ডাকিলেন ; তাহাকে বলিলেন, “আমর সঙ্গে আয় ।” কুল্‌সম্ তাঁহঁর সঙ্গে গেল ।

কুল্‌সম্কে সঙ্গে লইয়া আমীর হোসেন পুনর্বার সমরুর তাবুতে উপস্থিত হইলেন । কুল্‌সম্ বাহিবে রহিল । ফষ্টর তখনও সমরুর তাবুতে বসিয়াছিল । আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, “যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমার এক জন বাদী আসিয়া আপনাকে শেলাম করে । বিশেষ কাণ্ড আছে ।”

সমরু অনুমতি দিলেন । ফষ্টরের হৃৎকম্প হইল—সে গাত্ৰোত্থান করিল । আমীর হোসেন হাসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন । কুল্‌সম্কে ডাকিলেন । কুল্‌সম্ আসিল । ফষ্টরকে দের্খিয়া নিষ্পন্ন হইয়া দাঁড়াইল ।

আমীর হোসেন কুল্‌সম্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে এ ?”

কুল্‌সম্ বলিল, “লরেন্স ফষ্টর ।”

আমীর হোসেন ফষ্টরের হাত ধরিলেন । ফষ্টর বলিল, “আমি কি করিবারছি ?”

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমকক্ষ  
বলিলেন.

“দায়েব! ইহার প্রেক্ষাপটে অল্প নবাব নাজিমের অস্থিতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলক।”

সমক বিখ্যিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃত্তান্ত কি?"

আমীর হোসেন বার্নার্ড, “পশ্চাৎ বলিব।” সমস্ত সঙ্গে  
 প্রহরী দিলেন, আমীর হোসেন ফটুরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

শঙ্কর পরিচ্ছেদ ।

আবার বেদগ্রামে ।

• বহুক্ষেপে চক্রশেখর শৈবগিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়া-  
ছিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে গৃহ, তখন অরণ্যাদিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় কড়ে উড়িয়া গিয়াছে; কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাগ বাঁকারি পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে বিবিড় জঙ্গল হইরাছে—উরগজাতি নির্ভয়ে তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ঘরের কষাট সকল চোরে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘর খোলা—ঘরে প্রায় সামগ্রী কিছুই নাই, কতক চোরে লইয়া গিয়াছে—কতক

সুন্দরী আপন গৃহে লইয়া গিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে । যত্নে বৃষ্টি প্রবেশ করিয়া জল বসিয়াছে—কোথাও পচিয়াছে, কোথাও ছাতা ধরিয়াছে । ইন্দুর, আরম্ভা, বাছড় পালে পালে বেড়াতেছে । চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর হাত ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

নিরীক্ষণ করিলেন যে, ঐ খানে দাঁড়াইয়া, পুষ্টকরাশি ভঙ্গ করিয়াছিলেন । চন্দ্রশেখর ডাকিলেন,

“শৈবলিনী ।”

শৈবলিনী কথা কহিল না ; কক্ষদ্বারে বসিয়া পূর্বদৃষ্ট করবোয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিল । চন্দ্রশেখর যত কথা কহিলেন, কোন কথার উত্তর দিল না—বিস্ফারিত লোচনে চারি দিক্ দেখিতেছিল—একটু একটু টিপি টিপি হাসিতেছিল—একবার স্পষ্ট হাসিয়া অঙ্গুলির দ্বারা কি দেখাইল ।

এ দিকে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন । অনেকে দেখিতে আসিতেছিল । সুন্দরী সন্ধ্যায়ে আসিল ।

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্রিপ্তাবস্থায় কথা কিছু শুনে নাই । প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল । দেখিল, চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মচারীর বেশ । শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, “তা, ওকে এনেছ বেশ করেছ । প্রাশস্তিত করিলেই হইল ।”

কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছে শুধু শৈবলিনী ধরিলও না, ঘোমটাও টানিল না বরং সুন্দরীর স্থানে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল । সুন্দরী

ভাবিল, “এ বুঝি ইংরেজি ধরণ, শৈবলিনী ইংরেজের সংসর্গে শিখিয়া আসিয়াছে।” এই ভাবিয়া, শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তকাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড়ে না ঠেকে। হাসিয়া শৈবলিনীকে বলিল, “কি লা! চিন্তে পারিস্?”

শৈবলিনী, বলিল, “পারি—তুই পার্কঁতী।”

সুন্দরী বলিল—“মরণ আর কি, তিন দিনে ভুলে গেলি?”

শৈবলিনী, বলিল,—“ভুলব কেন লো—সেই যে তুই আমার ভাত ছুঁয়ে ফেলেছিলি বলিয়া, আমি তোকে মেয়ে শুঁড়া নাড়া কল্পুম। পার্কঁতী দিদি একটি গীত গাঁ না?

আমার মরম-কথাতাই লো ভাই।

আমার জ্ঞানের বাসে কই সে রাই?

আমার মেঘের কোলে কই সে ঠাদ?

মিছে লো পেতেছি পিরীতি-ফাদ।

কিছু ঠিক পাইনে পার্কঁতী দিদি—কে যেন নেই—কে যেন ছিল, সে যেন নেই—কে যেন আসবে, সে যেন আসে না—কোথা যেন এজ্ঞাছি, সেখানে যেন আলি নাই—কাকে যেন ধুঁজি, তাকে যেন চিনি না।

সুন্দরী বিস্মিতা হইল—চন্দ্রশেখরের যুগ পানে চাহিল—চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন। সুন্দরী নিকটে আসিলে তাহার কর্ণে বলিলেন, “নাগল হইয়া গিয়াছে।”

সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্চকে হইল, তার পুরে পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জলবিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কীমতে দাগিল। জীবাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর এক দিন

কামনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনীও যেন নৌকাসহিত জলমগ্ন হইয়া য়ে । আজি সুন্দরীর জ্ঞান শৈবলিনীর জ্ঞান কেই কাতর নহে ।

সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শৈবলিনীর কাছে বসিল—ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে ধীরে পুঙ্খকথা শ্রবণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু শ্রবণ করিতে পারিল না । শৈবলিনীর স্থতির বিলোপ ঘটে নাই—তাহা হইলে পার্শ্বভী নাম মনে পড়িবে কেন ? কিন্তু প্রকৃত কথা মনে পড়ে না—বিকৃত হইয়া, বিপরীতে বিপরীত সংগ্ৰহ হইয়া মনে আসে । সুন্দরীকে মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল না ।

সুন্দরী, প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে আনাহারের জন্ত পাঠাইলেন ; পরে সেই ভয় গৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ক্রমে ক্রমে, প্রতিবাসিনীরা একে একে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল ; আনন্ডক সামগ্রী সকল আসিয়া পড়িতে লাগিল ।

এ দিকে প্রতাপ মুন্সের হইতে ঔত্যাগমন করিয়া, লাঠিয়াল সকলকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া, একবার গৃহে আসিয়াছিলেন । গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন । দ্বারের তাঁহায়ে দেখিতে বেদগ্রামে আসিলেন ।

• সেই দিন রমানন্দ স্বামীও সেই স্থানে পূর্বে আসিয়া দর্শন দিলেন । আব্দুল্লাহ সহকারে সুন্দরী শুনিলেন যে, রমানন্দ স্বামীর উদ্দেশ্যানুসারে, চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগ করিবেন । ঔষধ প্রয়োগেরী শুভ লক্ষ্য অব্যাহতি হইল ।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### যোগবল না PSYCHIC FORCE ?

ঔষধ কি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্ত, চন্দ্রশেখর বিশেষরূপে আশ্রয় করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সহজে জিতেন্দ্রিয়, কুংপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল অত্যাশ্রয়। তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহার উপরে কঠোর অনশনভূত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মনকে কয়দিন ইহাতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলেন—‘পারমার্থিক চিন্তা’ ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই।

অবধারিত কালে চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শৈবলিনীর জন্ত, শয্যাচনা করিতে বলিলেন; স্নানীয় নিবৃত্তা পরিচালিকা শয্যাচনা করিয়া দিল।

চন্দ্রশেখর তখন সেই শয্যায় শৈবলিনীকে শুয়াইতে অমুমতি করিলেন। স্নানীয় শৈবলিনীকে ধরিয়া বলপূর্বক শয়ন করাইল—শৈবলিনী সহজে কথা শুনে না। স্নানীয় গৃহে গিয়া স্নান করিবে—প্রত্যাহ করে।

চন্দ্রশেখর তখন সকলকে বলিলেন, “তোমরা একবার বাহিরে যাও। আমি ডাকিবামাত্র আসিও।”

সকলে বাহিরে গেলে, চন্দ্রশেখর করত ঔষধপাত্র হাতীতে রাখিলেন। শৈবলিনীকে বলিলেন, ‘উঠিয়া রূপ দেখি।’

শৈবলিনী, বৃহ বৃহ গীত গারিতে লাগিল—উঠিল না । চন্দ্রশেখর স্থিরদৃষ্টিতে তাহার নরনের প্রতি নরন স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে গণ্ডুষ গণ্ডুষ করিয়া এক পাত্র হইতে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন । রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, “ঔষধ আর কিছু নহে, কমণ্ডলুস্থিত জলমাত্র ।” চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ইহাতে কি হইবে?” স্বামী বলিয়াছিলেন, “কত্না ইহাতে যোগবল পাইবে ।”

তখন চন্দ্রশেখর তাহার ললাট চক্ষু, প্রভৃতির নিকট নানা প্রকার বক্রগতিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন । এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল, অচিরে শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িল—ঘোর নিদ্রান্বিত হইল ।

তখন চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, “শৈবলিনী !”

শৈবলিনী, নিদ্রাবস্থার বলিল, “আজ্ঞে ।”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “আমি কে ?”

শৈবলিনী পূর্ববৎ নিদ্রিতা—কহিল, “আমার স্বামী ।”

চ । তুমি কে ?

শৈ । শৈবলিনী ।

চ । এ কোন্ স্থান ?

শৈ । বেদগ্রাম—আপনার গৃহ ।

চ । বাহিরে কে কে আছে ?

শৈ । প্রতাপ ও সুল্লরী এবং অন্যান্য বাক্তি ।

চ । তুমি এখান হইতে গিয়াছিলে কেন ?

শৈ । ফষ্টর সাহেব লইয়া গিয়াছিল বলিয়া ।

চ । এ সকল কথা এত দিন তোমার মন পড়ে নাই কেন ?

শৈ। মনে ছিল—ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না।

চ। কেন ?

শৈ। আমি পাগল হইয়াছি।

চ। সত্য সত্য না কাপটা আছে ?

শৈ। সত্য সত্য কাপটা নাই।

চ। তবে এখন ?

শৈ। এখন এ যে স্বপ্ন—আপনার গুণে জানলাত করি-  
য়াছি।

চ। তবে সত্য কথা বলিবে ?

শৈ। কলিষ।

চ। তুমি ফুটবলের সঙ্গে গেলেন কেন ?

শৈ। প্রতাপের জন্ত।

চন্দ্রশেখর চমকিয়া উঠিলেন—সহস্রচক্ষে বিগত ঘটনা সকল  
পুনর্দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

“প্রতাপ কি তোমার জার ?”

শৈ। ছি! ছি!

চ। তবে কি ?

শৈ। এক বোটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়া  
ছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিয়াছিলেন কেন ?

চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার  
অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুকায়িত রহিল না। জিজ্ঞাসা করি-  
লেন,

“যে দিন প্রতাপ স্নেহের নোকা হইতে পলাইল, সে দিনে,  
পক্ষার সীতার মনে পড়ে ?”



শৈ। পড়ে।

চ। কি কি কথা হইয়াছিল ?

শৈবলিনী সংক্ষেপে আত্মপূর্ব্বিক বলিল। তিনিই চন্দ্রশেখর মনে মনে প্রত্যাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তবে তুমি ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন ?”

শৈ। বাসমাত্র। যদি পুন্দরপুনে গেলে প্রত্যাপকে পাই, এই ভরসার।

চ। বাস মাত্র—তবে কি তুমি সাধ্বী ?

শৈ। প্রত্যাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—  
এজন্ত আমি সাধ্বী নহি—মহাপাপিষ্ঠা।

চ। নচেৎ ?

শৈ। নচেৎ সম্পূর্ণ সত্য।

চ। ফষ্টর সম্বন্ধে ?

শৈ। কারমনোবাক্যে।

চন্দ্রশেখর খর খর দৃষ্টি করিয়া, হস্ত সঞ্চালন করিয়া কহিলেন,

“সত্য বল।”

নিদ্রিতা যুগলী অকুণ্ঠিত করিল, বলিল—“সত্যই বলিয়াছি।”

চন্দ্রশেখর আবার নিখাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন,

“তবে ব্রাহ্মণকন্যা হইয়া আতিব্রটী হইতে গেল কেন ?”

শৈ। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদণ্ডী। বলুন আমি আতিব্রটী কি না।

আমি তাহার অন্ন খাই নাই—তাহার স্পৃষ্ট বস্তু খাই নাই।  
এতাহ বহুতে পাক করিয়া খাইয়াছি। হিন্দু পরিচারিকার

আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এক নৌকার বাস করিয়াছি বটে—  
কিন্তু গঙ্গার উপর।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন ;—অনেক ভাবিলেন—  
বলিতে লাগিলেন, “হার! হার! কি কুক্ষণ করিয়াছি—  
জীহতা করিতে বসিয়াছিলাম।” অনেক পরে জিজ্ঞাসা  
করিলেন,

“এ সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন?”

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

চ। এ সকল কথা কে জানে?

শৈ। ফষ্টর আর পার্জুতা।

চ। পার্জুতা কোথায়?

শৈ। মাসাবধি হইল বুকেরে মগ্নিয়া গিয়াছে।

চ। ফষ্টর কোথায়?

শৈ। উদয়নামায় নবাবের শিবিরে।

চন্দ্রশেখর কিরংকণ চিন্তা করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তোমার রোগের কি প্রতিকার হইবে—বুঝিতে পার?”

শৈ। আপনার বোগবল আমাকে দিয়াছেন—তৎপ্রসাদে  
জানিতে পারিতেছি—আপনার শ্রীচরণ কৃপায়, আপনার ঔষধে  
আরোগ্য লাভ করিব।

চ। আরোগ্য লাভ করিলে কোথায় বাইতে ইচ্ছা কর?

শৈ। যদি বিব পাউ ত খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

চ। মরিতে চাও কেন?

শৈ। এ সংসারে আমার স্থান কোথায়?

চ। কেন, আর্মীর গৃহে?

শৈ । আপনি আর গ্রহণ করিবেন ?

চ । যদি করি ?

শৈ । তবে কার্যমানে আপনার, পদসেবা করি । কিন্তু আপনি কলঙ্কী হইবেন ।

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল । চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার যোগবল নাই—রমানন্দ স্বামীর যোগবল পাইয়াছ,—বল ও কিসের শব্দ?”

শৈ । ঘোড়ার পার্শ্বের শব্দ ।

চ । কে আসিতেছে ?

শৈ । মহম্মদ ইরফান্—নবাবের সৈনিক ।

চ । কেন আসিতেছে ?

শৈ । আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন ।

চ । ফক্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, না তৎপূর্বে ?

শৈ । না । দুই জনকে আনিতে এক সময় আদেশ করেন ।

চ । কোন চিন্তা নাই, নিদ্রা বাও ।

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর সকলকে ডাকিলেন । তাহারা আসিলে বলিলেন যে, “এ নিদ্রা যাইতেছে । নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ ঔষধ খাওয়াইও । সম্ভ্রতি, নবাবের সৈনিক আসিতেছে—কলা শৈবলিনীকে লইয়া যাইবে । তোমরা সত্বে যাইও ।”

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল । চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ইহাঙ্কে নবাবের নিকট লইয়া যাইবে ?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “এখনই গুনিবে, চিন্তা নাই।”

মহম্মদ ইরফান্ আসিলে, প্রতাপ তাঁহার অভির্থনার নিযুক্ত হইলেন। চন্দ্রশেখর আদ্যোপান্ত সকল কথা রমানন্দ স্বামীর কাছে গোপনে নিবেদিত করিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “আগামী কলা আমাদের ছুই জনকেই নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে।”

## সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

দরবারে ।

বৃহৎ আশুব মধ্যাহ্নে, বার দিয়া বাজালার শেষ রাজা বসিরা-  
ছেন—শেষ রাজা, কেন না, মীর কাসেমের পর যাহারা বাজা-  
লার নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন  
নাই।

বার দিয়া, মুক্তাশ্রবালরক্তকাক্ষনশোভিত উচ্চাগনে, নবাব  
কাসেম আলি খাঁ, মুক্তাহীরামণ্ডিত হইয়া শিরোদেশে  
উকীষোপরি উজ্জলতম সূর্য্যমুখ দীপকপুঞ্জস্থিত করিয়া, দর-  
বারে বসিরাছেন। পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভৃত্যবর্গ যুক্তহস্তে  
দণ্ডায়মান—অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া আহুত হারা ভূমি স্পর্শ  
করিয়া, নীরবে বসিয়া আছেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—  
“বন্দীগণ উপস্থিত ?”

মহম্মদ ইব্রাহীম বলিলেন, “সকলেই উপস্থিত ।” নবাব, প্রথমে লরেঞ্জ্ ফষ্টরকে আনিতে বলিলেন ।

লরেঞ্জ্ ফষ্টর আনীত হইয়া সন্মুখে দণ্ডায়মান হইল । নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তুমি কে ?”

লরেঞ্জ্ ফষ্টর ব্যগ্নিরাছিলেন যে, এবার নিস্তার নাই । এত-কালের পর ভাবিলেন, “এতকাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি—এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব ।”

“আমার নাম লরেঞ্জ্ ফষ্টর ।”

নবাব । তুমি কোন্ জাতি ?

ফষ্টর । ইংরেজ ।

ন । ইংরেজ, আমার শত্রু—তুমি শত্রু হইয়া আমার শিবিরে কেন আনিয়াছিলে ?

ফ । আসিয়াছিলাম, সে জ্ঞাত আপনার যাহা অভিক্রটি হয়, করুন—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি । কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না ।

নবাব তুচ্ছ না হইয়া হাসিলেন, বলিলেন, “জানিলাম তুমি ভয়শূন্য । সত্য কথা বলিতে পারিবে ?”

ফ । ইংরেজ কখন মিথ্যা কথা বলে না ।

ন । বটে ? তবে দেখা বাউক । কে বলিয়াছিল যে চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন ? থাকেন, তবে তাঁহাকে আন !

মহম্মদ ইব্রাহীম চন্দ্রশেখরকে আনিলেন । নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া কহিলেন, “তাহাকে চেন ?”

ক। নাহ তনিরাহি—চিনি না।

ন। ভাল। বাদী কুলসম্ কোথায় ?

কুলসম্ও আসিল।

নবাব ফটরকে কহিলেন, “এই বাদীকে চেন ?”

ক। চিনি।

ন। কে এ ?

ক। আপনার দাসী।

ন। মহম্মদ তাকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইরফান্, তাকি খাঁকে বক্ষাবস্থায় আনীত করিলেন।

তাকি খাঁ এতদিন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন্ পক্ষে যাই ; এই ক্ষণ শত্রুপক্ষে আজিও মিলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাসী জানিয়া নবাবের সেনাপতিগণ চক্রে চক্রে রাখিয়াছিলেন। আলি হিরাহিম্ খাঁ অনারাসে তাহাকে বাধিয়া আনিয়াছিলেন।

নবাব তাকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন,

“কুলসম্ ! বল, তুমি-মুন্সের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে।”

কুলসম্, আত্মপূর্বিক সকল বলিল। দলনী বেগমের বৃত্তান্ত সকল বলিল। বলিয়া যোড়হন্তে, সজলনয়নে, উঠেঃস্বরে বলিতে লাগিল—“জাহাপনা ! আমি এই আন দরবারে, এই পাণিষ্ঠ, জীযাতক মহম্মদ তাকিম্, নাহে নাগিশ করিতেছি, গ্রহণ করন ! সে আমার প্রত্নপত্নীর নামে বিখ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রত্নকে বিখ্যা প্রবকনা করিয়া, সংসারের জীবনসার

দলনী বেগমকে পিণীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—  
জাঁহাপনা ! পিণীলিকাবৎ এই নরধর্মকে অকাতরে হত্যা করুন ।”

মহম্মদ তকি, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “মিথ্যা কথা—তোমার  
সাক্ষী কে ?”

কুলসম, বিস্ফারিতলোচনে, গর্জ্জন করিয়া বলিল—“আমার  
সাক্ষী ! উপরে চাহিয়া দেখ—আমার সাক্ষী স্বর্গদীপ্তর ! আপনাব  
বুকের উপর হাত দে—আমার সাক্ষী তুই । যদি আর কাহারও  
কথার প্রয়োজন থাকে, এই ফিরিশ্বীকে জিজ্ঞাসা কর ।

না । কেমন, ফিরিশ্বী, এই বাঁদী যাত্রা যাত্রা বলিতেছে,  
তাহা কি সত্য ? তুমিও ত আমিরটের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ  
সত্য ভিন্ন বলে না ।

“কষ্টের বাহা জানিত, প্রকৃপ বলিল । তাহাতে সকলেই  
বুঝিল, দলনী অনিন্দনীয় । তকি অধোবদন হইয়া রছিল ।

“তখন, চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “ধর্ম্মা-  
বতার ! বাঁদীর কথা যে সত্য, আমিও তাহার একজন সাক্ষী ।  
আমি সেই প্রকৃচরী ।”

কুলসম তখন চিনিলা । বলিল, “ইনিষ্ট বটে ।”

তখন চন্দ্রশেখর বলিতে লাগিলেন, “রাস্তান্, যদি এই ফিরিশ্বী  
সত্যাবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই একটা কথা প্রশ্ন করুন ।”

নবাব বুঝিলেন,—বলিলেন, “তুমিই প্রশ্ন কর—যিহাযীতে  
বুঝাইয়া দিবে ।”

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বলিয়াছ চন্দ্রশেখর  
নাম ওনিয়াছ—আমি সেই চন্দ্রশেখর ! তুমি তাহার—”

চন্দ্রশেখরের কথা লক্ষ্য হইতে না হইতে কষ্ট বলিল,—

“আপনি কষ্টে পাইবেন না। আমি স্বাধীন—মরণ ভয় করি না। এখানে কোন প্রেমের উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা। আমি আপনার কোন প্রেমের উত্তর দিব না।”

নবাব অমুসতি করিলেন, “তবে শৈবলিনীকে আন।”

শৈবলিনী আনীতা হইল। কষ্টের প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী রুগ্মা, শীর্ণা, মলিনা,—জীর্ণ সজীর্ণ বাসপরিহিতা—অস্বস্তিকৃতকৃতলা—ধূলিধূসরা। গারে খড়ি—মাথায় গুলি,—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের জিজ্ঞাসাবাদক দৃষ্টি। কষ্টের লিহরিল,

নবাব দ্বিজ্ঞান করিলেন, “ইহাকে চেন ?”

ক। চিনি।”

ন। এ কে ?

ক। শৈবলিনী,—চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি প্রকারে ?

ক। আপনার অভিশ্রুতি—যে দণ্ড থাকে—অমুসতি করিয়া।  
—আমি উত্তর দিব না।

ন। আমার অভিশ্রুতি, কুহুরদশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

কষ্টের মূখ বিগত হইল—হস্ত পদ কাঁপিতে লাগিল। কিছুকণে ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইল—বলিল,

“আমার মৃত্যুই যদি আপনার অভিশ্রুতি হয়—অন্ত প্রকার মৃত্যু আজ্ঞা করুন।”

ন। না। এ দেশে একটি প্রাচীন হুণ্ডের কিয়দন্তী আছে। অপরাধীকে কটি পর্দায়, মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে—তাহার গয়ে তাহাকে দংশনার্থ লিখিত কুহুর নিযুক্ত করে। কুহুরে



দংশন করিলে, কতস্থখে লবণ দৃষ্টি করে। কুকুরেরা মাংস-  
ভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অর্ধভুক্ত অপরাধী  
অর্দ্ধমৃত হইয়া প্রোথিত থাকে—কুদুরদিগের ক্ষুধা হইলে  
তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস খায়। তোমার ও তকি  
খাঁর প্রতি সেই মৃত্যুর বিধান করিলাম।

বন্ধনযুক্ত তকি খাঁ আর্ত পশুর জায় বিকট চীৎকার করিয়া  
উঠিল। ফঠর আশু পাতিয়া, ভূমে বসিয়া, যুক্ত করে, উর্দ্ধনয়নে  
জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিল—মনে মনে বলিতে লাগিল,  
“আমি কখনও তোমাকে ডাকি নাই, কখনও তোমাকে ভাবি  
নাই, চিরকাল পাপই করিয়াছি! তুমি যে আছু, তাহা কখনও  
মনে পড়ে নাই। হিন্দু আজি আমি নিঃসহায় বলিয়া, তোমাকে  
ডাকিতেছি—হে নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! আমার  
রক্ষা কর!”

কেহ বিস্মিত হইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে  
পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিতাবে ডাকে। ফঠরও ডাকিল।

নয়ন বিনত করিতে ফঠরের দৃষ্টি তাম্বু বাহিরে পড়িল।  
সহসা দেখিল, এক জটাঙ্গুটধারী, রক্তবস্ত্রপরিহিত, খেতশ্রম-  
বিহ্বিত, বিভূতিরঞ্জিত পুরুষ, দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করি-  
তেছেন। ফঠর সেই চক্ষু প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—  
ক্রমে তাহার চিত্ত দৃষ্টির বশীভূত হইল। ক্রমে চক্ষু বিনত  
করিল—যেন দাক্ষণ নিম্নার তাহার শরীর অংশ হইয়া আসিতে  
লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই জটাঙ্গুটধারী পুরুষের  
জটীক বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ক্রমে  
সজলজলদগন্তীর কর্ণধনি যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

কষ্টের শুনিল যেন কেহ বলিতেছে, “আমি তোকে কুকুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব।” আশ্চর্য কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার ?”

কষ্টের একবার সেই ধূলিধূসন্ধিতা উদ্ভাদিনী প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল—“না।”

সকলেই শুনিল “না! আমি শৈবলিনীর জার নহি।”

সেই বহুগন্তীর শব্দে শূন্যকার প্রস্থ হইল। নবাব প্রশ্ন করিলেন, কি চিত্রশেখর, কি কে করিল কষ্টের তাহা বুঝিতে পারিল না—কবল শুনিল যে গন্তীর স্বরে প্রশ্ন হইল, “তবে শৈবলিনী তোমার নোকায় ছিল কেন ?”

কষ্টের উচ্চঃস্বরে বলিতে লাগিল, “আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নোকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, সে আমার প্রতি আদর। কিন্তু দেখিলাম যে তাহা নহে ; সে আমার শত্রু। নোকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছত্রিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, ‘তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছত্রিতে ছত্ৰনেই মরিব। আমি তোমার মৃতকৃত্য।’ আমি তাহার নিকট বাইতে পারি নাই। কখনও তাহাকে স্পর্শ করি নাই।” সকলে এ কথা শুনিল।

চিত্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই শৈবলিনীকে তুমি কি প্রকারে স্নেহের অন্ন খাওয়াইলে ?”

কষ্টের কুণ্ঠিত হইয়া বলিল “একদিনও আমার অন্ন বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই। সে নিজে রান্ধিত।”

প্রশ্ন—“কি রান্ধিত ?”

ফটর—“কেবল চাউল—অমের সঙ্গে হুঙ তির আর কিছু  
থাইত না ।”

প্রশ্ন । “অল ?”

ক । “গঙ্গা হইতে আগনি তুলিত ।”

এমন সময়ে সহসা—শব্দ হইল, “ধুম্ ধুম্ ধুম্ ধুম্ !”

নবাব বলিলেন, “কি ও ?”

ইরফান্ কাতরখ্বরে, বলিল, “আর কি ? ইংরেজের কামান-  
তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে ।”

সহসা তাহু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল ।  
“হুড়ুম্ হুড়ুম্ হুম্” আবার কামান গর্জিতে লাগিল । আবার !  
বহুতর কামান একত্রে শব্দ করিতে লাগিল—ভীম নাদ লক্ষ  
লক্ষ নিকটে অগ্নিসিতে লাগিল—রণবাদ্য বাজিল—চারিদিক্  
হইতে তুন্দুল কোলাহল উখিত হইল । অমের পদাঘাত, অস্ত্রের  
ঝঞ্ঝনা—সৈনিকের জয়ধ্বনি, সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জিয়া উঠিল—  
ধুমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইলে—দিগন্ত বাপ্ত হইল । অসুস্থি-  
কালে যেন অলোচ্ছ্বাসে উছলিয়া, স্কন্ধ সাগর আসিয়া বেড়িল ।

সহসা নবাবের অসাত্যাবর্গ, এবং ভূত্যাগণ, ঠেলাঠেলি  
করিয়া তাহুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলা-  
য়নে । কুলসন্, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও ফটর ইহারাও বাহির  
হইল । তাহু মধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন ।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাহুর মধ্যে পড়িতে  
লাগিল । নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিক্ষেপিত  
করিয়া, তকির বক্ষে সহজে বিদ্ধ করিলেন । তকি মরিয়া  
নবাব তাহুর বাহিরে গেলেন ।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

যুদ্ধক্ষেত্রে ।

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন । স্বামী বলিলেন, “চন্দ্রশেখর ! অতঃপর কি করিবে ?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “এক্ষণে, শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি-  
কি প্রকারে ? চারিদিকে গোলা বৃষ্টি হইতেছে ।” চারিদিক ধূমে  
অন্ধকার—কোথায় বাইব ?”

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “চিন্তা নাই,—দেখিতেছ না, কোন্-  
দিকে যবনসেনাগণ পলায়ন করিতেছে ? সেখানে যুদ্ধারম্ভই পলা-  
য়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি ? এই ইংরেজ জাতি  
অতিশয় ভাগ্যবান—বলবান—এবং কৌশলময় দেখিতেছি—বোধ  
হয় ইহারা এক দিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে । চল  
আমরা পলায়নপরায়ণ যবনদিগের পশ্চাৎ হই । তোমার আমার  
অস্ত্র চিন্তা নাই, কিন্তু এই বধূর অস্ত্র চিন্তা না।”

তিন জনে পলায়নোদ্ভূত যবন সেনার পশ্চাদ্গামী হইলেন ।  
অকস্মাৎ দেখিলেন, সমুখে একদল সুসজ্জিত অস্বধারী হিন্দুসেনা  
—বগনভ হইয়া দৃঢ় পর্বতশৃঙ্গ-পথে নির্গত হইয়া ইংরেজরণে  
সম্মুখীন হইতে বাইতেছে । মধ্যে, তাহাদিগের নায়ক, অবা-  
রোহণে । সকলেই দেখিয়া চিনির্লেন যে, প্রতাপ ।

চন্দ্রশেখর প্রতাপকে দেখিয়া বিমনা হইলেন। কিঞ্চিৎ পূর্বে  
বিমনা হইয়া বলিলেন, “প্রতাপ ! এ চূড়ায় যণে তুমি কেন ?  
ফের ।”

“আমি আপনাদিগের সঙ্কল্পনই আসিতেছিলাম। চলুন,  
নির্দিষ্ট স্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসি।”

এই বলিয়া প্রতাপ, তিন জনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্য-  
স্থানে স্থাপিত করিয়া ফিঙ্গিয়া চলিলেন। তিনি পর্তমানামধান  
নির্গমন পথ সকল সবিশেষ অবগত ছিলেন। অবিলম্বে তাহা-  
দিগকে, সমর-ক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া গেলেন। গমন কালে  
চন্দ্রশেখরের নিকট, দরবারে যাচা বাছা দৃষ্টিগোচর, তাহা সবি-  
স্তারে শুনিলেন। তৎপরে চন্দ্রশেখর “প্রতাপকে বলিলেন,  
“প্রতাপ, তুমি ধনু ; তুমি বাহা জান, আমিও তাহা  
জানি।”

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া চন্দ্রশেখরের মুখ পানে চাহিয়া রহি-  
লেন।

চন্দ্রশেখর বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, “একণে জানিলাম  
যে, ইনি নিম্পাপ। যদি লোকরঞ্জনায় কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে  
হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইহাকে গৃহে লইব। কিন্তু  
ঈশ্বর আর আমার কপালে হইবে না।”

প্র। কেন, আমার ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই ?

চ। এ পর্য্যন্ত নহে।

প্রতাপ বিমর্ষ হইলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল।  
শৈবলিনী অবগুষ্ঠন মধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিল— শৈবলিনী  
একটু সরিয়া গিয়া, হস্তোদ্ভিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিল—

প্রতাপ অথ হইতে অবতরণ করিয়া, তাঁহার নিকটে গেলেন । শবলিনী অন্তের অশ্রাব্য স্বরে প্রতাপকে বলিল, “আমার একটা কথা কানে কানে শুনিব ? আমি দৃষ্টান্ত কিছুই বলিব ।”

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন, “তোমার বাতুলতা কি প্রতিম ?”

শৈ। একপে বটে । অগ্নি প্রাতে, শয্যা হইতে উঠিয়া সববি সকল কথা বুদ্ধিতে পারিতেছি । আমি কি সত্য সত্যই মৃগল হইয়াছিলাম ?

প্রতাপের মুখ প্রকৃত হইল । শবলিনী, তাঁহার মনের কথা বুদ্ধিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “চুপ । একপে কিছু বলিও না । আমি নিজেই সকল বলিব—কিন্তু তোমার অহুমতিসাপেক্ষ ।”

প্র। আমার অহুমতি কেন ?

শৈ। স্বামী যদি আমার পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন, তবে মনের পাণ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয় ?

প্র। কি করিতে চাও ?

শৈ। পূর্বকথা সকল তাঁহাকে বলিয়া, কন্যা চাহিব ।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, “বলিও ! আশীর্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও ।” এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।

শৈ। আমি স্ত্রী নষ্ট ন । তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনী ?

শৈ। . যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না । জ্বীলোকের চিত্ত অতি অসার ; কত দিন বশে থাকিবে জানি না । এই এক্ষণে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না ।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না । দ্রুতপদে অঝারোহণ করিয়া, অথৈ কষাঘাতপূর্বক সম্মুখেক্রান্তিমুখে ধাবমান হইলেন । তাহার সৈন্তগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল ।

গমনকালে চন্দ্রশেখর, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা যাও ?”

প্রতাপ ইলিলেন, “যুদ্ধে ।”

চন্দ্রশেখর আশ্চর্য্যে উঠেঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “যাইও না । যাইও না । ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই ।”

প্রতাপ বলিলেন, “ফষ্টের এখনও জীবিত আছে । তাহার বধে চলিলাম ।”

চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অঁখের বঁধা ধরিলেন । বলিলেন,

“ফষ্টের বধে কাজ কি ভাই ? যে ছুটে, ভগবান্ তাহার দণ্ড বিধান করিবেন । . তুমি আমি কি দণ্ডের কৰ্ত্তা ? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে ; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে !”

প্রতাপ, বিস্মিত, পুনরিত্ত হইলেন । এক্রপ মহতী উক্তি তিনি কখনও শ্রোতুমুখে শ্রবণ করেন নাই । অব্য হইতে অবতরণ করিয়া চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন । বলিলেন, “আপনিই মহাত্মা মধ্যে ধত্ত । . আমি ফষ্টকে কিছু বলিব না ।”

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অঝারোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন । চন্দ্রশেখর বলিলেন, .

“প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন ?”

প্রতাপ, মুখ ফিরাইয়া অতি কামল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, “আমার প্রয়োজন আছে ।” এই বলিয়া অশ্রু-স্রাবাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন ।

সেই হাসি দেখিয়া রমানন্দ স্বামী উদ্ভিগ্ন হইলেন । চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও । আমি ক্রান্তমানে বাইব । দুই এক দিন পরে সাক্ষাৎ হইবে ।”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “আনি প্রতাপের ক্ষত অন্তস্ত উদ্ভিগ্ন হইতেছি ।” রমানন্দ স্বামী বলিলেন “আমি তাহা তত্ত্ব লইয়া বাইতেছি ।”

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে পবিত্র করিয়া দিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন । সেই ধূমময়, আহতের আর্তচীৎকারে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্যবৃষ্টির মধ্যে, প্রতাপকে ইতস্ততঃ অব্যবণ করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, কোথাও পবের উপর পব স্তূপাকৃত হইয়াছে—কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত, কাহারও অঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ “জল ! জল !” করিয়া, আর্তনাদ করিতেছে,—কেহ মাতা, ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু প্রভৃতির নাম করিয়া ডাকিতেছে । রমানন্দ স্বামী সেই সকল পবের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না । দেখিলেন, কত অঝারোহা কধিরাক্ত কলেবরে, অস্থিত অশ্বের গৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া পলাইতেছে, অশ্বপদে কত হতভাগ্য আহত বোদ্ধ বর্গ দগিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে ।



তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের সন্ধান করিলেন, পাইলেন না দেখিলেন, কত পদাতিক, রিক্তহস্তে উর্দ্ধ্বাসে, রক্তমাখি হইয়া পলাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না ।

শ্রান্ত হইয়া রমানন্দ স্বামী এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন সেই খান দিয়া একজন সিপাহী পলাইতোছিল । রমানন্দ স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা সকলেই পলাইতেছ— তবে যুদ্ধ করিল কে ?”

সিপাহী বলিল, “কেহ নহে । কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে ।”

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কোথা ?” সিপাহী বলিল “গড়ের সম্মুখে দেখুন ।” এই বলিয়া সিপাহী পলাইল ।

রমানন্দ স্বামী গড়ের দিকে গেলেন । দেখিলেন, যুদ্ধ নাই কয়েকজন ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতদেহ একত্র দৃশ্যকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । স্বামী, তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করতে লাগিলেন । পতিত হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ গভী কাতরোক্তি করিল । রমানন্দ স্বামী তাহাকে টানিয়া বাহি করিলেন, দেখিলেন, সেই প্রতাপ ! আহত, মৃতপ্রায় এখন জীবিত ।

রমানন্দ স্বামী, জল আনিয়া তাহার মুখে দিলেন । প্রতাপ তাহাকে চিনিয়া প্রণামের অন্ত, হস্তোত্তোলন করতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না ।

স্বামী বলিলেন, “আমি অমনিই আত্মীকৃত করিতেছি আরোগ্য লাভ কর ।”

প্রতাপ কষ্টে বলিলেন “আরোগ্য ? আরোগ্যের আর বড় বিলম্ব নাই । আপনার পদক্ষেপে আমার সাধার দিন ।”

রমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন এ দুর্জয় রণে আসিলে ? শৈবলিনীর কথা কি একরূপ করিয়াছ ?”

প্রতাপ বলিল, “আপনি, কেন একরূপ আজ্ঞা করিতেছেন ?”

স্বামী বলিলেন, “যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা-কহিতেছিলে, তখন ডাঙ্কার আকারে দিত দেগিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সে আর উন্মাদগ্রস্তা নহে । এবং বোধ হয়, তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া নাই ।”

প্রতাপ বলিলেন, “শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয় । আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের স্মৃতির সম্ভাবনা নাই । যাহারা আমার পরিত্রাণের পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের স্মৃতির কটক স্বরূপ এ জীবন আমার সাধা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম । তাই, আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সময়ক্ষেত্রে, প্রাণত্যাগ করিতে, আমি গিয়াছিলাম । আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিন্তা, কখনও না কখনও বিচলিত হইবার সম্ভাবনা । অতএব আমি চলিলাম ।”

রমানন্দস্বামীর চক্ষে জল আসিল ; আর কেহ কখনও রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই । তিনি বলিলেন, “এ সংসারে তুমিই বস্তুতঃ পরিত্রাণপ্রদাতারী । আত্মা তত্ত্বমাত্র । তুমি পরলোকে অনন্ত আনন্দ স্বর্গভোগ করিবে সন্দেহ নাই ।”

কণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দস্বামী বলিতে লাগিলেন,

“তন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ড-  
জয় তোমার এই ইঞ্জিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি  
শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?”

শুশ্রূষ সিংহ যেন আগিয়া উঠিল। সেই শব্দকার প্রত্যাপ,  
বলিষ্ঠ, চক্ৰল, উন্নতবৎ হহকার করিয়া উঠিল—বলিল—“কি  
বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার  
এ ভালখালা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আজি এই ঘোড়শ বৎসর,  
আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিন্তে আমি  
তাহার প্রতি অমুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নান—জীবন-  
বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে,  
অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অমুরাগ অহোমাত্র বিচরণ করি-  
য়াছে। কখনও মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা  
জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন  
কেন? এক্ষণে এ অমুরাগে মগ্ন নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ  
করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর  
হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায়  
নাই—এই জ্ঞান মরিলেন। আপনি এই শুশ্রূষ তত্ত্ব তুলিলেন  
—আপনি জানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী—আপনি বলুন, আমার  
পাপের কি প্রারম্ভিত? আমি কি ভগবান্দের কাছে দোষী?  
যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রারম্ভিতে কি তাহার মোচন  
হইবে না?”

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান  
এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে দুর্বল। তুমি যে লোকে যাই  
তেছ, সেই লোকের ভিন্ন এ কথাই কেহ উত্তর দিতে পারিবে

না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইঞ্জিরজয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বৰ্গ তোমারই। যদি চিত্তসংঘর্মে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাত্ত তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বৰ্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বৰ্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, অন্তঃকরে যেন তোমার মত ইঞ্জিরজয়ী হই।”

রমানন্দ স্বামী নীরবে শুইলেন। ধীরে ধীরে প্রত্যাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। ভৃগু-শয্যায়, অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বৰ্গভক পড়িয়া রহিল।

তবে যাও, প্রত্যাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইঞ্জির-জয়ে কষ্ট নাই, ক্লেশ মোহ নাই, অগ্নয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও! যেখানে, রূপ অনন্ত, অগ্নয় ক্লান্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের ভক্ত পরকে মরিতে হয় না, সেই মহেশ্বরানন্দের লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।















